এখন ডুয়ার্স

জানুয়ারি ২০১৯। ২০ টাকা

স্বাগত ২০১৯

নতুন বছরের ক্যালেন্ডার সঙ্গে

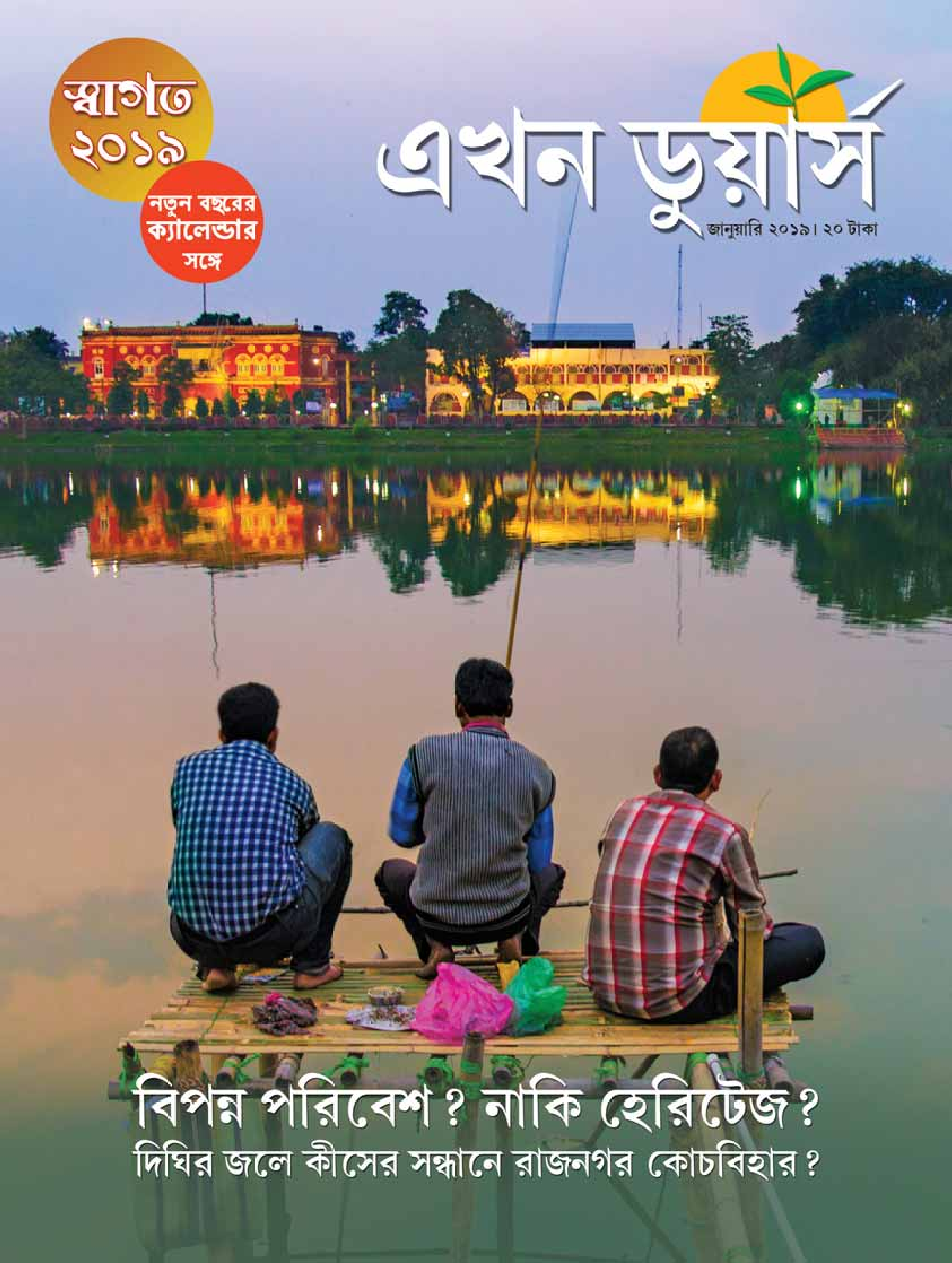

বিপন্ন পরিবেশ? নাকি হেরিটেজ?

দিঘির জলে কীসের সন্ধানে রাজনগর কোচবিহার?

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের কলমে ৩

বিশেষ রচনা

ঋণ মকুব নয়, কৃষককে জমিমুখী করতে চাই

সহযোগিতার নিবিড় সমণ্বয় ও প্রয়োগ ৬

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

তরাইয়ের একটি সুন্দর জনপদ ফাঁসিদেওয়া ৯

পথের কুকুর হইতে সাবধান! ১০

পাঠকের কলমে

ফিনিক্স পাখির মত জেগে উঠবে 'অনিন্দ্য'? ১১

হে হেরিটেজ

সভ্যতা থেকে মুখ লুকাচ্ছে গোসানীমারির গড়! ১২

লাল ইট আর জ্যোৎস্না রঙা গন্ধ ১৪

বিপন্ন পরিবেশ? নাকি হেরিটেজ? দিঘির জলে কীসের সন্ধানে

রাজনগর কোচবিহার? ১৫

পর্যটন

জলঢাকার কোলে দুটি রাত ২০

ডুয়ার্সের হেথা হোথা

ডুয়ার্স থেকে দার্জিলিং, দ্বিতীয় পর্ব ২৩

শ্রীমতি ডুয়ার্স

মুসলিম রমণীদের অধিকার রক্ষার্থে সুসঙ্গত আইন আনা জরুরি! ২৫

পৌষের মিঠা ঘ্রাণ ২৬

আমার মেয়েবেলা ২৮

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

মহারাণী কথা ৩০, লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর ৩৩

প্রতিবেশি পিএনপিসি

কোচবিহার থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল ২০১৮ ৩৬

শিশু কিশোরদের জন্য সাংস্কৃতিক সংস্থা ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ৪, রাসায়নিক রস ৩৮

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি

বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির

অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি

ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

মালবাজার

সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা

দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি

রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া

বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট

জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৭৪৯৭২৫৭৮১

লাটাগুড়ি

সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি

দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা

অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

তুফানগঞ্জ

আনন্দবাজার বুক স্টল ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১

দিনহাটা

হরিপদ রায় ৯৯৩২৬৩৯০৬৮

আলিপুরদুয়ার

দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার

জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪

মালদা

অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৯৯৩২৯৬৭৯৯১

বালুরঘাট

মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

Resort Sonar Bangla

Gorumara National Park

Phone: 03561-266558, +91 8348228111 mail: tirthankar_18@rediffmail.com

এখন ডুয়ার্স

পঞ্চম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৯

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ
শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া
মুদ্রণ
অ্যালবাট্রস
ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ
গৌতমেন্দু রায়

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদকের কলমে

কুড়ি উনিশ বনাম উনিশ কুড়ি

রাষ্ট্রসংঘ এই বছরটিকে অর্থাৎ ২০১৯ সালকে দেশীয় ভাষার আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসেবে পালন করবার আহবান জানিয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকেই জানা যায়, দুনিয়া জুড়ে প্রায় সাত হাজার দেশজ ভাষা রয়েছে, যার মধ্যে আড়াই হাজারেরও বেশি ভাষার অদৃষ্টে এখন অবলুপ্তির করাল ছায়া। তাঁরা মনে করেন, যেহেতু ভাষাই পারে বিপন্ন এ পৃথিবীর এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের আত্মিক যোগাযোগ ঘটাতে, সেইজন্য কোনও জাতির নিজেদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-কৃষ্টি ও ইতিহাসকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে হলে, সেইসঙ্গে নিজেদের মানবাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে আর চেতনাকে জাগিয়ে রাখতে হলে দেশীয় ভাষাকে গুরুত্ব দিতেই হবে। কোনও দেশীয় ভাষার অবলুপ্তির অর্থ তার জাতিসত্ত্বাই সংকটে। আজ যখন বাংলা ভাষার গভীর ক্ষয়িষ্ণুতার কাল, ঐতিহ্য বিস্মৃত বাঙালি তার আত্ম পরিচিতি নিয়ে ভুগতে শুরু করেছে, এসময় রাষ্ট্রসংঘের দেশজ ভাষা নিয়ে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতেই হয়।

অথচ প্রাকৃতিক নিয়মেই কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ঠিক একশ বছর আগের কথাই ধরি। ১৯২০ সালকে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি তথা পুরো বাঙালি জাতির পুনরুত্থানের দশক হিসেবে গণ্য করেন সমাজবিজ্ঞানীরা। স্বাধীনতার লড়াই যখন তুঙ্গে, গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হল, সেই সময় প্রমথনাথ চৌধুরী, ফজলুল হক, চিত্তরঞ্জন দাশের মত নেতারা খুঁজে নিচ্ছিলেন নতুন স্বদেশি পথ, ফেলে আসা উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবোধের ভাবনা ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছিল বাঙালি মনন থেকে। দেশের রাজধানী সদ্য সরে গেছে দিল্লিতে, কলকাতা-হাওড়ার চাইতে অনেক বেশি দ্রুতহারে উঠে আসছিল মফস্বল, সেখানকার মানুষরা দখল নিচ্ছিল বাংলার ভাষা-সাহিত্য-রাজনীতির। হিন্দি-উর্দুর দাদাগিরিকে দূরে সরিয়ে রেখে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলা ভাষাকে আঁকড়ে ধরেছিল রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে। বাংলা সাহিত্যে তখন কল্লোল যুগ, উঠে আসছিলেন একের পর পর নতুন লেখক, রাজনৈতিক ভাবনা। ধ্রুপদী রবীন্দ্র সাহিত্যের পাশে জায়গা করে নিচ্ছিলেন বিদ্রোহী নজরুল।

বাংলায় নতুন নারীবাদী ভাবনাও জোরদার হয়েছিল সেই সময়। ১৯২০কে তারই সূচনা লগ্ন বলা যায়। ফিরোজা বেগম, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, অনুরূপা দেবীরা তখন তাঁদের লেখনিতে প্রশ্ন তুলেছেন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে, নারী শিক্ষার পক্ষে, নারীর অধিকার নিয়ে। বীণা ভৌমিকের মত কংগ্রেসের নারী কর্মীরা সেসময় প্রতিবাদী প্রশ্ন তুলেছেন, গান্ধিজি কেন বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের সমর্থন করতে দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন তাই নিয়ে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গান্ধিজির নীতির বিকল্প হিসেবে এসময়ই একাধিক পথের সন্ধান শুরু করেছিল বাঙালি, বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ থেকে শুরু করে কমিউনিজম পর্যন্ত সব ভাবনারই নিরীক্ষাগার ছিল এই বাংলা। তারই তরঙ্গ স্পন্দন পৌঁছেছিল সাধারণ মানুষের মনে। আর তারই ফলস্বরূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতার সময় দেখা গেল শিক্ষায় সাহিত্যে শিল্পে কৃষিতে এবং মননে চেতনায় বাংলা খণ্ডিত হৃদয়েও নাম্বার ওয়ান।

তার পরের বাহাত্তর বছর ধরে চলেছে বাংলার হনন কাল। কিন্তু ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি করে। আজ রাজনীতির বেনিয়া প্যাঁচে দুই খণ্ডিত বাংলার ভেতরের দরজা জানালা একের পর এক খুলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন রাজনীতির প্রভুরা। ওপারের মুক্ত বাংলা থেকে আলো বাতাস হু হু করে ঢুকে পড়ছে এপারে। বাংলা গান ও ছবির জনপ্রিয়তা আজ এপারে বাড়তে দেখছি আমরা চোখের সামনে, কালকে সামগ্রিক ভাবনায় বদল আসতে বাধ্য।

এদিকে অদ্ভুতভাবে স্বাধীন ভারতের শাসক কংগ্রেস এই বাহাত্তর বছরে পূর্ব ভারত থেকে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। অথচ কারও সন্দেহ নেই আজ পুবের ভারত উঠে আসছে নতুন উদ্যমে অভাবনীয় দ্রুত গতিতে, বাংলা-বিহার-ওড়িশা ফের গোটা দেশের ভবিতব্য নির্ধারণ করবে কাল। ভোটের অঙ্কে আসন্ন নির্বাচনে বাংলা এক কঠিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, আর নির্বাচনের ফলই অনেকটা বলে দেবে বাংলার ভাগ্য-ভবিষ্যৎ। একশ বছর পর, ১৯২০ মতই ২০১৯ সাল বাংলা-র পুনরুত্থানের সম্ভাবনায় থর থর উত্তেজিত। নতুন বছরকে তাই দু'হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানাই।

খুব শীত পড়িয়াছে। দার্জিলিংয়ে স্নো পড়িতেছে। রক্তবস্ত্র পরিহিত সান্টা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমিতির সদস্যগণ আসন্ন পিকনিক লইয়া উত্তেজিত। গহন অরণ্যে ইয়া ইয়া ডিজে বাজাইয়া কে কেমন নাচিবে তাহা লইয়া প্ল্যান হইতেছে। জঙ্গলে তান্ডব করিয়া পিকনিক করিতে হইলে ঢাল দরকার। ঠিক হইয়াছে শক্তিমান কোনও যুবনেতাকে ফ্রি-তে লইয়া যাওয়া হইবে। আমি ভাবিলাম, যাই। সান্টাকে খেপাইয়া খুচরা রচনা শুরু করি। তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলাম, 'কোথায়? কোথায় গেলে?'

'এই তো কোচরাজ্য হইতে আসিলাম।'

'আচ্ছা সান্টা! কও দেখি, কোচবিহার বন্দরে উড়োজাহাজ কবে নামিবে উঠিবে?'

যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহার সাতগুণ খেপিয়া সান্তা কহিল, 'বৈকুণ্ঠপুরের সার্কিট বেঞ্চি আর কোচরাজ্যের পুষ্পকরথ নিয়ে ফের যদি কিছু বলেছ তো নেক্সট টাইম গেরুয়া পরে আসব! জয় শ্রী জিসাস!'

সান্টাকে হ্যাপি এক্স রশ্মি, থুড়ি, মাস জানাইয়া খুচরা কুড়াইতে বাহির হইলাম। দৈনিক প্রাতরাশ পত্রিকার সাংবাদিক পার্কে বসিয়া স্টোরি লিখিতেছিল। প্রায় একখানি শর্ট স্টোরি নামাইয়া মুখ তুলিয়া জিগ্যাসিল, 'কী চাই?'

'কিছু যদি কও তো খুচরায় লিখি।'

'ধূপগুড়ি গিয়ে টার্মিনেটর বিষয়ে খোঁজ নিন।'

ট্রাক টার্মিনেটর

স্টোরি লাইনটা এইরূপ। স্পিলবার্গ মেইল করিয়াছে। ধূপগুড়ি নামক শহরে দুই একর জমির ওপর ট্রাক টার্মিনাস। কিন্তু সে টার্মিনাস এখন টার্মিনেটর। ধরুন আপনি ঝাঁ চকচকে ট্রাক সেখানে রেখে স্নান করতে গেলেন। এসে দেখলেন ট্রাক খানিকটা কম পড়িতেছে। কোনও কোনও অংশ ভ্যানিশ! ভয়ে আপনার লোম খাড়া! তাকালেন। সামনেই সারি সারি মৃত ট্রাক। জোম্বির মত হেডলাইট ফেলছে আপনার মুখে। ঘড়াং ঘং! আপনার ট্রাকের টায়ার হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! চারদিকে ভয়াল ভৌতিক হর্ন। আপনার ট্রাক আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছে। শেষে মরেই গেল! ধূপগুড়ি ট্রাক টার্মিনাসে কেবল ট্রাকের ভূতেরাই থাকে।

পড়িয়া ভাবিলাম, একটু বাড়াইয়া লিখিয়াছে। কিন্তু ধূপগুড়ি ট্রাক টার্মিনাসে খোঁজ লইয়া জানিলাম, কমই লিখিয়াছে। সেখানে নাকি যত্ন সহাকারে ট্রাক টার্মিনেট করা হইয়া থাকে। মন্ত্রী খবর পাইয়াছেন। বলিয়াছেন, ভূত তাড়াইবার বাজেট হইতেছে।

সর্পরোগি

শুনিলাম, বিষ দিয়া গন্ডার-চিতা হত্যা করা হইতেছে। মরিলে ভালো কথা কিন্তু না মরিলে পশুদের ঝামেলা অনেক। বিষ খাইয়া মরিবার ব্যাপার তাহাদের মধ্যে নাই। চিকিৎসাও নাই। তাই মানুষের হাতে পড়িয়া না মরিয়া আহত হইলে দোপায়াদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রই ভরসা। সম্ভবতঃ এই কারণেই একটু সর্প সুচিকিৎসা লাভের আশায় কামাক্ষ্যাগুড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আস্ত প্রবেশ করিয়া সটান ল্যাবরুমে আস্তানা গাড়িয়াছিল। ডাক্তার দেখিলে টেস্ট করিতে দিবেই। তাই আগে থেকে ল্যাবে থাকলে ঝামেলা শেষ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইল, সর্পরোগিটির চিকিৎসা হয় নাই। তাহাকে ফেরৎ পাঠান হইয়াছে। দুর্জনেরা কহিতেছে, ভরা শীতে সাপ গর্ত

ছেড়ে ল্যাবে গেছে কারণ সেখানে কেউ ঢোকেই না। তা হ্যাঁ রে মুখপোড়ার দল! ঢোকে না তো সাপ পাইল কী ভাবে?

হাট্টাগোল

হাট লইয়া নাকি বৈকুণ্ঠপুর জেলা পরিষদের পারিষদবর্গ মহা চাপে। হাতে তাদের আড়াই ডজন হাট। কিন্তু হাটবাবু মোটে একখানি। তদুপরি হাটের মাটি নাকি যে যাহার মত বাঁটিয়া লইতেছে। আড়াই ডজন হাটে কাহারা বসিতেছে, কাহারা বেচিতেছে, কাহারা লুটিতেছে— সে-ও এক রহস্য। কোথায় হাটের মালিক হইয়া গর্ব হইবে তা নয়, হাট বসাইতেই ফতুর হইবার জো! তাই পরিষদ ঠিক করিয়াছে, হাটেই হাঁড়ি ভাঙিয়া দিবে। এমন কড়া স্টেপ লইবে যে হাট চালাইয়া লাট সাহেব হওয়ারা পালাইয়া কূল পাইবে না। কী ভাবে তাহা ঘটিবে তাহা অবশ্য জানা যায় নাই। তবে অচিরেই যে হাটগুলি না বসিয়া দৌড়াইবে, তাহা নিশ্চিত।

ইহা জানিয়া আমি স্বেচ্ছায় আধ ডজন হাটে গিয়া হাটুরেদের এই শুভ সংবাদ জানাইতেই তাঁহারা গুয়া সুপারি চিবাইয়া পিক ফেলিয়া কহিল, 'পাটের শাড়ি, ঘাটের নারী আর হাটের বাড়ি— এই তিনের স্বভাব বদলায় কার সাধ্যি? বেশি কড়া হইলে অনেকের দালান হাট হইয়া যাইবে।

পরে জানিয়াছিলাম, ইংরাজিতে হাট শব্দের অন্য মানে। যাহা হউক। কে জানি কহিল, মোহিতনগর ফার্মে গম গাছেদের মশারির ভেতরে রাখা হয়েছে। শুনিয়াই ছুটিলাম। গমদের কি মশা কামড়াইল? গমগাছের কি ডেঙ্গি হয়?

গম ও কাকাগম

যাইয়া দেখি ডেঙ্গি নয়। তাই তো! গমের তো রক্ত নাই। মশা চুষিবে কী? কিন্তু সত্যই তাহারা মশারির আশ্রয়ে শীতের রোদ্দুরে শীতের হাওয়া খাইয়া দুলিতেছে। ইহার পর খোঁজ করিয়া জানিলাম, কাকেরা নাকি এখন ডাক্তারের পরামর্শে রুটি খাইতেছে। তবে আটা হইতে রুটির পুষ্টি লইবার পরিবর্তে কাকেরা শর্টকাট ধরিয়াছে। কচি কচি গমের দানা পাকিতে শুরু করিলেই তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া খাইয়া ফেলে। কিন্তু বাজারে তো কাকের অরি বিকোয় না, তাই কাকারির বদলে মশারি লাগাইয়া কাকাগম ঠেকাইবার ফন্দি। বোঝা গেল, কাকেরা এই বছর মহা ঠকিয়াছে। আশা করি পরের বার মশারি ফুটা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করা শিখিয়া যাইবে। ফার্মের লোক ইহা শুনিয়া আমাকে ভাগাইয়া দেয় আর কি! কিন্তু আমার কী দোষ! কাককে যদি রুটি না দাও তবে তো সে গম খাইবেই! কাকের বদলে হাতি হইলে কী করিতে?

গাড়িয়া মাদারিয়া

খুচরা যোগারে অনেক ঘাম ঝরাইয়া কমলাভোগ খাইব বলিয়া মাদারিহাট আসিয়াছি। শুনিলাম সেইখানকার কোটালের নাকি দুঃখের অন্ত নাই। কোটালের সেপাই-সান্ত্রী-ঢাল-তলোয়ার মন্দ নাই, কিন্তু রথ মাত্র একখানি। সেই সবেধন নীলমণি গাড়ির বয়স হইয়াছে প্রায় আঠার। সারাক্ষণ খাই খাই বাতিক। এক লিটার ডিজেল খাইয় কিলোমিটার ছয়েক ছুটিয়া হাঁফাইয়া যায়। পঞ্চাশ কিলোমিটারের বেশি গতি নাই। ছেলে-ছোকরা অপকম্ম করিয়া আশি মাইল গতিতে বাইক ছুটাইলে ধরিবে কী করিয়া? তদ্ব্যতীত পঞ্চাশ কিলোমিটার স্পিড তুলিলে এমন চেহারা হয় যে ড্রাইভারের টেনশনের শেষ থাকে না। কত্তবার মাতাল-পাগল গ্রেপ্তার করিবার পর তাহাদের দিয়া গাড়ি ঠেলাইয়া থানায় আসিতে হইয়াছে! সামনে ভোট আসিতেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ছুটিতে হইবে। তাহারা ছুটিবে ঘোড়ায় আর মাদারি কোতয়াল ছুটিবে বুড়ো গাধায়? বামামলের গাড়ি নীলসাদা যুগে চলিবে কেন? পুলিশ কার এখন গতি হারাইয়া ফুলিশ কার!

মিস্টার চুড়ি সিং

গরুমারার নিকট নিত্য নতুন রিসর্ট গজাইতেছে। লাটাগুড়ি হইতে বর্ষার পানি বাহির হইবার মুখগুলি ঢাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু চুড়ি সিং বদলাইতেছে না। চুড়ি সিং হইলেন জনৈক নিঃসঙ্গ, রোমান্টিক, ভবঘুরে গন্ডার। এমনিতে জঙ্গলে একখানি গন্ডার থাকিলে তিনখানি গন্ডারনি থাকা দরকার। কিন্তু অনুপাত বজায় থাকিতেছে না। গন্ডারেরা রামায়ণ পড়িয়াছে। তাহার বলেন 'জয় শ্রীদশরথ!' তাই তিনখানার কম গার্লফ্রেন্ডে বিশ্বাসী নহেন। কিন্তু ডুয়ার্সের জঙ্গলে গন্ডারনি বাড়ন্ত পরিবেশ অন্যেরা মানিয়াছে বলিয়া চুড়ি সিং মানিবে? সে ঘন ঘন গরুমারা ছাড়িয়া ভাগিতেছে। বনকর্তা-কর্মিগণ হেজিয়া আকুল! গালি দাও, ভয় দেখাও, প্রেস্টিজে খোঁচা দাও— চুড়ি সিং গায়ে মাখে না। কেন মাখিবে? উহার চামড়া সত্যই গন্ডারের মতন। মনে হয় তাহার কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা পৃথক পৃথক অরণ্যে থাকেন। প্রেমে না পড়িলে এত দুঃসাহস আসে কোথা হইতে?

ভাগ্যফল

পরিশেষে সংক্ষেপে ২০১৯-এর ভাগ্যফল বলিতেছি। মনে রাখিতে হইবে, কাজ করিয়া যাও। ভাগ্যফলের আশা করিও না।

মেষ— অ্যাসিডিটি ইগনোর করিতে শিখিবেন। বৃষ— গোমাতার যুগে আপনার উন্নতির আশা কম। মিথুন— যা ঘটিবে তাহাই ভাবিতে হইবে। কর্কট— পয়সার চিন্তা দূর হইবে, টাকার চিন্তা থাকিবে। সিংহ— আপনি কি সত্যই সিংহ? ভাবিয়া দেখিবেন। কন্যা— জুলাই-এর পর যাহা আশা করিতেছেন ফেসবুকে ঘটিবে। তুলা— এই বৎসর অন্য কাউকে ভোট দিবেন। বৃশ্চিক— মদ্যপানে আসক্তি থাকিলে ব্র্যান্ড বদল করিবেন। ধনু— স্ত্রী কিংবা স্বামীর মতিগতি বুঝিবার পক্ষে আদর্শ বৎসর। মকর— উপার্জন বৃদ্ধি করেন, সম্মুখে পরকীয়া। কুম্ভ— বহুদিনের ইচ্ছা পূরণ হইবে। আপনি অনুপ্রাণিত হইবেন। মীন— নায়ক হইবার বৎসর। নায়িকা ভিলেন পাইবে।

কলম সিং

ছড়রা

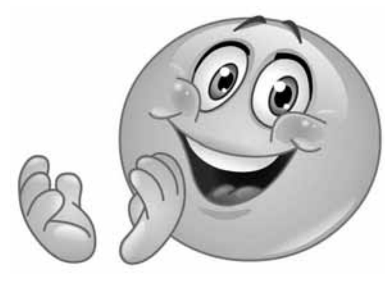

বইমেলা খইমেলা বইখেলা

বই টই টই টই বই মেলা!
হই হই হই চই কোন জেলা?
থই থই রই রই বোঝো রে!
কই কই বই কই খোঁজো রে!!
ধেই ধেই তাতা থেই নেচে যাও!
দেই দেই ভাতা দেই বেচে খাও!!
পই পই করে কই এই বেলা!
লই বই করি বই বই খেলা!!

সনাতন ছন্দ

(ব্যঙ্গ ছড়া পাঠান। বিষয় সাম্প্রতিক সময়।
ইমেল: editor.ekhonduars@yahoo.com)

বিশেষ রচনা

ঋণ মকুব নয়, কৃষককে জমিমুখী করতে চাই সহযোগিতার নিবিড় সমন্বয় ও প্রয়োগ

জলপাইগুড়ি জেলার সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জেলার কৃষি আয়নায় এই প্রতিবেদন। অনেকদিন আগে থেকেই এই জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে ভুটান, নেপাল, সিকিম, দিনাজপুর, রংপুর ও কোচবিহার দ্বারা শাসিত হয়েছে। এই জেলার কোন এলাকা কামতাপুর বা কামরূপের শাসনাধীন ছিল তা নির্ধারণ করা এই সময়ে অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে এই জেলার সীমানা বহুবার পরিবর্তন হয়েছে, কেটে ছেটে ছোট করা হয়েছে। ১৮৭২ সনে ডুয়ার্স-এর পূর্ব দিকের কিছু অংশ অসমের গোয়ালপাড়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ১৮৮০ সনের চুক্তির নিরিখে ভুটানকে ১১ বর্গ মাইল এলাকা প্রদান করা হয় আবার ১৮৮৮ সনের পয়লা অক্টোবর ভুটানের ২০ বর্গ মাইল এলাকা ক্রয় করে জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে যোগ করা হয়। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেন অদূর ভবিষ্যতে রাজগঞ্জ ব্লকের ডাবগ্রাম ১নং, ডাবগ্রাম ২নং, ফুলবাড়ি ১নং ও ফুলবাড়ি ২নং এই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত শিলিগুড়ির সঙ্গে সংযুক্তি ঘটবে। অথচ অন্যদিকে অবস্থানের নৈকট্য ও অধিবাসীদের অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও ওই মহকুমাটিকে জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চিন্তা করা হয় নাই।

যাই হোক, বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক আয়তন ৩৩৮৬.১৬ বর্গ কিমি। গড় বৃষ্টিপাত ৩৫০০ মি.মি। অর্থাৎ এই জেলায় বৃষ্টি নির্ভর চাষ-আবাদের সুযোগ প্রকৃতির দান। জেলার মোট কৃষি জমির পরিমাণ ১,৯৮,২৫৬ হেক্টর। আবাদের ঘনত্ব ১৮৬ শতাংশ, কিছুদিন আগেও এই ঘনত্ব ছিল ১০০ শতাংশের আশপাশে। বোঝাই যাচ্ছে বেশির ভাগ জমিই ছিল এক ফসলি। প্রকৃতিগত কারণেই এলাকার অধিবাসীরা একটু আরামপ্রিয়, প্রাকৃতিক কারণে একটু অলস। জেলার মূল কৃষি ছিল ধান ও পাট এবং কিছুটা তামাকও উৎপন্ন হত। বিগত শতাব্দির আশির দশকে সারা জেলায় রবি ফসলের চাষ আবাদ শুরু হল উৎপাদন বৃদ্ধির কথা, লাভের কথা মাথায় রেখে। আলুচাষ শুরু হল বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি মেনে। সঙ্গে সঙ্গে চলল টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, ফুল কপি, বাঁধা কপি এবং করলার চাষ। প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি

প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ব্লকে রবি ফসলের চাষ অনেকটাই কর্পোরেট সংস্কৃতির আকার নিয়েছে। বড় বড় কৃষি বাজার (মান্ডি), রাসায়নিক সার ও ওষুধের ব্যবসা, প্রায় দুই ডজন হিমঘর ও বিশাল পরিবহণের ব্যবসা এলাকার অর্থনীতি আমূল পাল্টে দিয়েছে।

ব্লকে রবি ফসলের চাষ অনেকটাই কর্পোরেট সংস্কৃতির আকার নিয়েছে। বড় বড় কৃষি বাজার (মান্ডি), রাসায়নিক সার ও ওষুধের ব্যবসা, প্রায় দুই ডজন হিমঘর ও বিশাল পরিবহণের ব্যবসা এলাকার অর্থনীতি আমূল পাল্টে দিয়েছে। যে কারণে ১,৫১,৫১৩.৬৮ হেক্টর এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা চা বাগানগুলো রুগ্ন হয়ে পড়া সত্ত্বেও জেলার অর্থনীতি ধ্বসে পড়েনি।

ইতিমধ্যে জেলা জুড়ে দশহাজারের বেশি ক্ষুদ্র চা-বাগান দ্রুত তাদের ব্যবসা বাড়িয়ে চলেছে। ২৫ একর পর্যন্ত জমিতে চা বাগান গড়ে তুললে তাদের ক্ষুদ্র চা-বাগান বা ক্ষুদ্র চা-চাষি বলা হয়ে থাকে। আমগুড়ি এলাকায় ক্ষুদ্র চা-চাষিরা স্বনির্ভর দল গঠন করেছে। তারা চা পাতা প্রসেসিংকারখানা তৈরি করেছে। শুধুমাত্র ক্ষুদ্র চা-চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা চা পাতা প্রসেস করে পানের উপযোগী করে তোলার জন্য জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ৪০-৪২ টি ফ্যাক্টরি কাজ করে চলেছে। প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এইসব কারখানাগুলোয়। বর্তমানে মোট চা উৎপাদনের ৫৫ শতাংশ ছোট চা বাগিচাতে উৎপন্ন হয়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর উৎপাদিত আনাজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ট্রাকে করে পৌছে যায়। বিশেষ করে টমেটো ও কাঁচালঙ্কার প্রচুর চাহিদা। উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আলু ছাড়াও অন্যান্য শীতের সবজির যথেষ্ট চাহিদা বর্তমান। ভুটান, নেপাল ও বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে সবজি এবং ফল রপ্তানি করা হয়ে থাকে।

ইদানিং কালে বাগিচা চাষেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় কলা চাষে, তেজপাতা বাগান, আনারস, তরমুজ এবং পাতি লেবু উৎপাদনে। যেহেতু বাগান চাষে স্থায়ী মূলধনের বিনিয়োগ বেশি সেই কারণে অনেক চাষি আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তাছাড়া সমস্ত জেলায় যে কোনও গ্রাম-শহরে প্রচুর সুপারি উৎপাদন হয়। অবহেলার সঙ্গেই সুপারি চাষ হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। কিছু এলাকায় নারকেল গাছও লক্ষ্য করা যায়। আশা করা যায় নারকেল সুপারি গাছের প্রতি যত্ন নিলে উৎপাদন বাড়তে পারে এবং আর্থিকভাবে লাভজনক হবে। এই জেলায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে সুপারি গাছের সঙ্গে গোলমরিচের চাষ করা সম্ভব, এর জন্য সচেতনতা ও প্রচার বাড়াতে হবে। স্থানীয় ভাবে সুপারিগাছে দেশি পানের চাষ কিছু এলাকায় হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে দেশি পানের যথেষ্ট চাহিদা বর্তমান। রাজবংশী সমাজে অতিথি আপ্যায়নে দেশি পান ও মজা সুপারি দেওয়ার রেওয়াজ যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে।

উত্তরবঙ্গে কাঁঠাল চাষের সম্ভাবনা প্রচুর। এই বাংলায় এত সহজে এমন কোনও ফল চাষ সম্ভবপর নয়। এই গাছের পাতা গৃহপালিত পশুর খাদ্য, কাঁচা ফল বা এচোড় সবজি, পাকা ফল রসাল ও সুমিষ্ট এবং গাছের কাঠ মূল্যবান। এমন একটা গাছের সমতুল কোন বাগিচা চাষের কথা উত্তরবঙ্গের মানুষ জানেই না। অথচ কাঁঠাল গাছ সবরকম অবহেলার মধ্যেই অঙ্কুরোদ্গম

ঘটায়, যত্ন ছাড়াই ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে। ডুয়ার্সের মানুষজন অতীতে জানালা-দরজা ও আসবাব পত্র বানানোর জন্য কাঁঠাল কাঠ ব্যবহার করত। ডুয়ার্সের একজন বিশেষজ্ঞ মানুষ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন বনোমহোৎসবের সময় ডুয়ার্সে পরপর পাঁচ বছর শুধু কাঁঠালগাছ লাগানো হোক, ২০ বছর পরে ডুয়ার্সের অর্থনীতি পাল্টে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের মোট আয়তনের ২.৭ শতাংশ হলেও দেশের মোট জনসংখ্যার ৭.৮১ শতাংশ এই রাজ্যে বাস করে। পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের ৬৬ শতাংশ চাষযোগ্য জমি। এই রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার প্রায় ৫৮ শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ কৃষি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। পূর্বের এক সমীক্ষায় দেখা যায় ৬৭.৮৯ লক্ষ কৃষক ক্ষুদ্র চাষি (জমি ১- ২ হেক্টর) এবং ৬৪.৭১ লক্ষ কৃষক প্রান্তিক চাষি (জমির পরিমাণ এক হেক্টরের কম), পশ্চিমবঙ্গের ৯৫.৩১ শতাংশ কৃষক ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষী। মোট ৫৫.৪৬ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমির ৭৯ শতাংশ জমি ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষির মালিকানাধীন। যেখানে ১৯৭০-৭১ সনে মোট ৪২.১৬ লক্ষ কৃষকের একজনের গড়ে ১.২০ হেক্টর জমি ছিল সেটা ২০০০-০১ সনে ৬৭.৮৯ লক্ষ কৃষকের একজনের গড়ে ০.৮২ হেক্টর জমি এবং ২০১০-১১ সনে আরও কমে ০.৫১হয়েছে। অর্থাৎ জমির মালিকের সংখ্যা বেড়েছে এবং জমি টুকরো টুকরো হয়েছে। এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে কৃষির যন্ত্রীকরণের কাজে সমস্যা তৈরী হয়েছে। যেখানে ২০০৫-০৬ সালে এইরাজ্যে মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন হয়েছে ১৫৬.৮৮ লক্ষ টন সেখানে ২০১৯-২০ সনের চাহিদা ২০০.০০ লক্ষ টনের কাছাকাছি। সে সময় মোট জন সংখ্যা ১১ কোটিতে পৌছে যাবে। খাদ্যে স্বয়ম্ভর হতে আধুনিক প্রযুক্তির বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার করতেই হবে। একটা সময় হয়ত আসবে যখন জমি আর মানুষের কথা শুনতে চাইবে না।

কিছু বিপদ নিবিড় ভাবে লক্ষ্য করা দরকার

১) উত্তর ভারতে খরিফ মরশুমে গড়ে দৈনিক ৭-৮ ঘন্টা সুর্যের আলো ও প্রায় ৮০ দিন স্থায়ী শীতকাল। সেখনে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ৫-৬ ঘন্টা সূর্যালোক এবং ৩০ দিন স্থায়ী শীতকাল। খরা-বন্যায় প্রতিবছর ৫-৮ শতাংশ ফসল নষ্ট হয়।

২) ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে ১-১.৫ শতাংশ ফল ও সবজি সংরক্ষিত হয় আর ২০-৩০ শতাংশ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়। সেখানে আমেরিকা, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্সে ৭০ শতাংশ উৎপাদিত ফল ও সবজি সংরক্ষিত হয়।

৩) কৃষিপ্রযুক্তির আশানুরূপ প্রয়োগ হচ্ছে না। সেই কারণেই গবেষণার সময় মাঠে বিঘায় ৩০ মন ফসল হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেটাই কৃষকের জমিতে বিঘা প্রতি ১৫ মন ফলন দিচ্ছে। বলা যেতে পারে প্রযুক্তির প্রয়োগ কৃষকের মাঠে ঠিক মত হচ্ছে না।

৪) দেখা যাচ্ছে সেচ সেবিত এলাকায় উৎপাদন স্থিতিশীল হয়ে আসছে, যদিও প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ছে। অবশ্যই মাটির স্বাস্থ্যহানি হওয়ার কারনেই এমনটা ঘটছে।

৫) রোগ-পোকা, আগাছা ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা ঠেকানোর জন্য বিষাক্ত ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। এর কুপ্রভাবে জল- মাটি ও পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে। সাপ, ব্যাঙ, কেঁচো ইত্যাদি প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটছে।

৬) হাইব্রিড ফসলের দাপটে দেশজ বীজ বা ফসল আর চোখেই পড়ে না। হয়ত এখান থেকেই অনেক বড় বিপদ হতে পারে।

আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এ রাজ্যের ছোট ছোট জমির ক্ষেত্রে কার্যউপযোগী হয় না

বর্তমানে ধানের সহায়ক মূল্য ১৭৫০ টাকা প্রতি কুইন্টাল, সমালোচকরা যাই বলুন এই মূল্য চাষির জন্য মরশুমের প্রথম দিকে লাভজনক। কিন্তু ধান ক্রয়কেন্দ্রগুলি আজও ফড়েদের খপ্পরেই, কৃষক নয় ফড়েরাই সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করছেন মিল মালিকদের কাছে। সরকার এ সমস্যা নিয়ে ওয়াকিবহাল, তবে সমাধান অত সহজ নয়।

যেসব সমন্বয় ও প্রয়োগ আশু প্রয়োজন

ক) জল ও ভুমির সংরক্ষণ, জৈব সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের দিকে দৃষ্টিপাত জরুরি।

খ) পতিত ও অকৃষিজ জমির সঠিক ব্যবহার জানা জরুরি।

গ) পার্বত্য, তরাই, লালমাটি ও উপকুলবর্তী এলাকায় উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে জোর দেওয়া দরকার। এর জন্য সুলভে কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং প্রশিক্ষনের প্রতি জোর দেওয়া প্রয়োজন।

ঘ) দেশীয় বীজ সংরক্ষণের সাথে উন্নত মানের সার ও বীজ সরবরাহ সুনিশ্চিত করা দরকার।

ঙ) জীবানু সার, কেঁচো সার, সবুজ সার ইত্যাদি জৈবসারের ব্যবহার এবং সালফার, অনুখাদ্য ও প্রধান খাদ্যযুক্ত রারায়নিক সারের সুসংহত প্রয়োগ নিশ্চিত করা দরকার।

চ) জৈব কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে সুসংহত উপায়ে শস্যশত্রু নিয়ন্ত্রন করা অত্যন্ত জরুরি।

ছ) কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি বিভাগের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কৃষি দপ্তর ও কৃষকদের আরও ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো প্রয়োজন।

জ) সেচের জলের পরিমিত ব্যবহার, বৃষ্টির জল ধরে রাখা, সেচ সেবিত এলাকা বাড়ানো ইত্যাদির বিষয়ে নজর দিতে হবে। জলপাইগুড়ি জেলার সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা তিস্তা সেচ প্রকল্প। ৪৩ বছর ধরে তার কাজ চলছে। চাষিরা এখনও তিস্তা সেচ প্রকল্পের জল পায় নি। জলপাইগুড়ি কৃষি দপ্তর ঘোষণা করেছে এ বছর চারটি ব্লকের ২২০০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষের সময় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের জল পাওয়া যাবে। লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমিতে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের জল পাওয়ার ঘোষণার দিন যে শিশু জন্ম নিয়েছিল সে আজ প্রৌঢ়ত্বের দোর গোড়ায়, কৃষকের স্বার্থে সেই ঘোষণা কাগজেই রয়ে গেছে।

ঝ) কৃষির সাথে সাথে মিশ্র খামার তৈরি করে মাছ চাষ, পশুপালন, বাগিচা চাষ, মৌমাছি পালন, মাশরুম চাষের সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জল।

ঞ) উৎপাদিত ফসলের সমর্থন মূল্য সময়মত নির্ধারণ করা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের যথেষ্ট সুযোগ বিদ্যমান। বর্তমানে ধানের সহায়ক মূল্য ১৭৫০ টাকা প্রতি কুইন্টাল, সমালোচকরা যাই বলুন এই মূল্য চাষির জন্য মরশুমের প্রথম দিকে লাভজনক। কিন্তু ধান ক্রয়কেন্দ্রগুলি আজও ফড়েদের খপ্পরেই, কৃষক নয় ফড়েরাই সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করছেন মিল মালিকদের কাছে। সরকার এ সমস্যা নিয়ে ওয়াকিবহাল, তবে সমাধান অত সহজ নয়।

ত) বিভিন্ন বিভাগের সাথে সমন্বয় স্থাপন করা, কৃষি গবেষণার উন্নতি ঘটানো, গবেষণার সুফল সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠে পৌছে দেওয়ার বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল ভাবনা দরকার।

থ) উন্নত মানের সার বীজ ও কীটনাশক সুলভে কৃষকের দোরে পৌছে দেওয়ার কার্যকরী পরিকল্পনা চাই।

দ) ফসল বীমার সরলীকরণ করে সবাই যেন এর উপভোক্তা হতে পারে তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

ড্রোন দিয়ে কীটনাশক স্প্রে এখন আধুনিক কৃষি পদ্ধতির অঙ্গ

ফুল ও ভেষজ চাষে বিপুল সম্ভাবনার কথা ভাবা হোক

১) **ফুল চাষের ক্ষেত্রে** উত্তরবঙ্গ অনেকটাই পিছিয়ে। এখানে গ্ল্যাডিউলাস, গাঁদা, জারবেরা ও ক্যাকটাস বাণিজ্যিক ভাবেই উৎপাদন করা যেতে পারে। প্রাথমিক বিনিয়োগ বেশি হওয়ায় কৃষকরা ফুল চাষে উৎসাহ বোধ করে না। বর্তমানে ৪০টি ফুলের একটা গাঁদা ফুলের মালার গড় দাম কুড়ি টাকা। একটা ভাল ব্যাসের জারবেরার খুচরা মূল্য ৭-৮ টাকা। ফুল চাষের সম্প্রসারণের জন্য সরকারিভাবে কোন দপ্তরের কোন আধিকারিক দায়বদ্ধ তা জীবিকান্বেষীরা জানে কি? ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু কাজ চলছে ঠিকই কিন্তু সেখানেও বিপণনের কোনও ব্যবস্থা নেই।

২) প্রাকৃতিক কারণেই ভেষজ উদ্ভিদ সম্পদে উত্তরবঙ্গ অনেকটাই এগিয়ে। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে সিট্রুনিলা, ইউক্যালিপটাস, সিনকোনা, বন তুলসী, কালমেঘ, হরিতকি পাওয়া যায়। বন সংলগ্ন গ্রামের মানুষ এইসব ভেষজ সংগ্রহ করে পাইকারদের সরবরাহ করেন। তাছাড়া অল্প শ্রমে ও বিনিয়োগে ঘৃতকুমারী, অশ্বগন্ধা, সর্পগন্ধা, তুলসী, শতমূলী, গুলঞ্চ, পুদিনা, নিশি প্রভৃতির আবাদের সম্ভাবনা প্রচুর।

ব্যাংক বনাম কৃষি দপ্তর!

উত্তরবঙ্গের কৃষকদের একটা বড় সমস্যা মাঠে বিনিয়োগের যথেষ্ট মূলধন তাদের হাতে নেই। যুগ যুগ ধরে তারা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে কৃষি কাজ করে এসেছে। ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৯৬৯ সনে সরকারীকরণের পর বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে। মোট ঋণের ৪০ শতাংশ অগ্রনী ক্ষেত্রে (যার মধ্যে কৃষিই প্রধান) দিতে বলা হয়েছে। অথচ সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে ঋনের টাকা কৃষকের হাতে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ আছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় জলপাইগুড়ি জেলার ১৩০টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ৮৩৩৮ কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করেছে আর ঋণ দিয়েছে ২৬৮৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ ক্রেডিট ডিপোজিট অনুপাত মাত্র ৩২ শতাংশ।

ব্যাঙ্কগুলো বারবার অভিযোগ করছে ঋণ আদায় বিশেষত কৃষি ক্ষেত্রে অত্যন্ত কম হওয়ায় এই সেক্টরে ঋণ দিতে তারা ভরসা পাচ্ছেন না। কৃষি দপ্তর বলছেন জেলার মোট ১,১৩,২৯০ কৃষকের মধ্যে ১,১০,৭০২ জন ইতিমধ্যে ঋণ পেয়েছেন। গড়ে একটি কৃষক পরিবার ৫৮২৩০ টাকা ঋণ পেয়েছেন। যাদের জমির কাগজ পত্র পরিষ্কার মোটামুটি সেইসব পরিবারের কেউ আর ঋণ নিতে বাকি নেই! অথচ ব্যাংকের তথ্য তাদের দাবিকে সমর্থন করছে কি?

কীটনাশক প্রয়োগে কতটা দুষিত হচ্ছে পরিবেশ? কতটা বিঘ্নিত হচ্ছে স্বাস্থ্য

ঋণ মকুব নয়, চাষির দরকার অল্প সুদে সময় মত ঋণ, কৃষি পণ্যের সঠিক মূল্য, ন্যায্যমূল্যে বীজ সার এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির সহায়তা। যে তরুণ কৃষকপুত্র লেখাপড়ার পালা শেষ করে হাতে লাঙল তুলে নিয়েছে কিংবা জমির অভাবে ভিন রাজ্যে শ্রমিক হতে গেছে সেই নতুন প্রজন্ম এই সত্যিটা ভাল করেই বোঝে।

এই বছর অর্থাৎ ২০১৮-১৯ সনে, জলপাইগুড়ি জেলায় বাইশ হাজার স্বনির্ভর দলকে ৫২০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। আশার কথা ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের প্রায় ৯০ শতাংশ টার্গেট তারা অর্জন করে ফেলেছে। জেলা গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর দৃঢ়তার সাথে বলছেন তারা এই লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই ছুঁয়ে ফেলবেন। শেষে আবার বলতে চাই অর্থের সঠিক ব্যবহার না জানলে যেমন অনর্থ ঘটতে পারে একইভাবে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না হলে উৎপাদন হ্রাস পেয়েও বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। স্বনির্ভর দলকে যে ঋণ দেয়া হয় তার ৭০ শতাংশ কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে।

আমরা ছেলেবেলা থেকেই জলপাইগুড়ি সদরের ক্লাব রোডে সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে এক প্রাচীন বাড়িতে কৃষি দপ্তরের বিবর্ণ অফিস দেখে এসেছি। এখন সেখানে একটা সাদামাটা হলেও পাঁচ তলা কৃষি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গত ৩১শে অক্টোবর আচার মেনেই তার উদ্বোধন হয়েছে কিন্তু ভবনটির নির্মান কার্য সম্পন্ন না হওয়ার জন্য এখনও সেখানে দপ্তরের কাজকর্ম চালু হয়নি। আমরা আশায় আছি ঘর যখন হয়েছে তখন একদিন না একদিন বাসিন্দারা অবশ্যই আসবেন।

ছেলেবেলা থেকে এও দেখে আসছি, কৃষক ঋণ মাথায় নিয়ে জন্মায় ঋণ মাথায় নিয়েই পরপারে যাত্রা করে। ঋণ মকুব করে সমস্যার সমাধান হবে না। নাবার্ড অনেকদিন আগে থেকেই ঋণ মকুব এর বিরোধিতা করে আসছে। ঋণ মকুব সর্বস্তরের ঋণগ্রহিতাদের মধ্যে ঋণ পরিশোধে অনীহা সৃষ্টি করে, যা অর্থনীতির পক্ষে মারণ রোগ তৈরির সামিল। ঋণ মকুব নয়, চাষির দরকার অল্প সুদে সময় মত ঋণ, কৃষি পণ্যের সঠিক মূল্য, ন্যায্যমূল্যে বীজ সার এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির সহায়তা। যে তরুণ কৃষকপুত্র লেখাপড়ার পালা শেষ করে হাতে লাঙল তুলে নিয়েছে কিংবা জমির অভাবে ভিন রাজ্যে শ্রমিক হতে গেছে সেই নতুন প্রজন্ম এই সত্যিটা ভাল করেই বোঝে। তাই ভাতার পর ভাতা কিংবা ঋণ মকুবের প্রতিযোগিতায় ভোট বৈতরণী পার হওয়ার খেলায় কৃষককুল আর নাও মজতে পারে! সম্প্রতি কৃষকের দুই লংমার্চ কিন্তু তামাম দুনিয়াকে জাগিয়ে দিয়েছে— শোষণ মাত্রাছাড়া হলে মানুষ তার অধিকার বুঝে নিতে আজও পথে নামে — সে দিল্লি হোক বা মুম্বাই কিংবা ব্যাঙ্গালোর বা কলকাতা— পতাকার রঙ লাল হোক বা সবুজ বা মেরুন— ক্ষমতার গদিতে বসে থাকা শাসকের পক্ষে যা কখনই সুখকর নয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার কৃষিবিজ্ঞানী গোষ্ঠ ন্যায়বান এবং গবেষক উমেশ শর্মা

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

শিলিগুড়ি

তরাইয়ের একটি সুন্দর জনপদ ফাঁসিদেওয়া

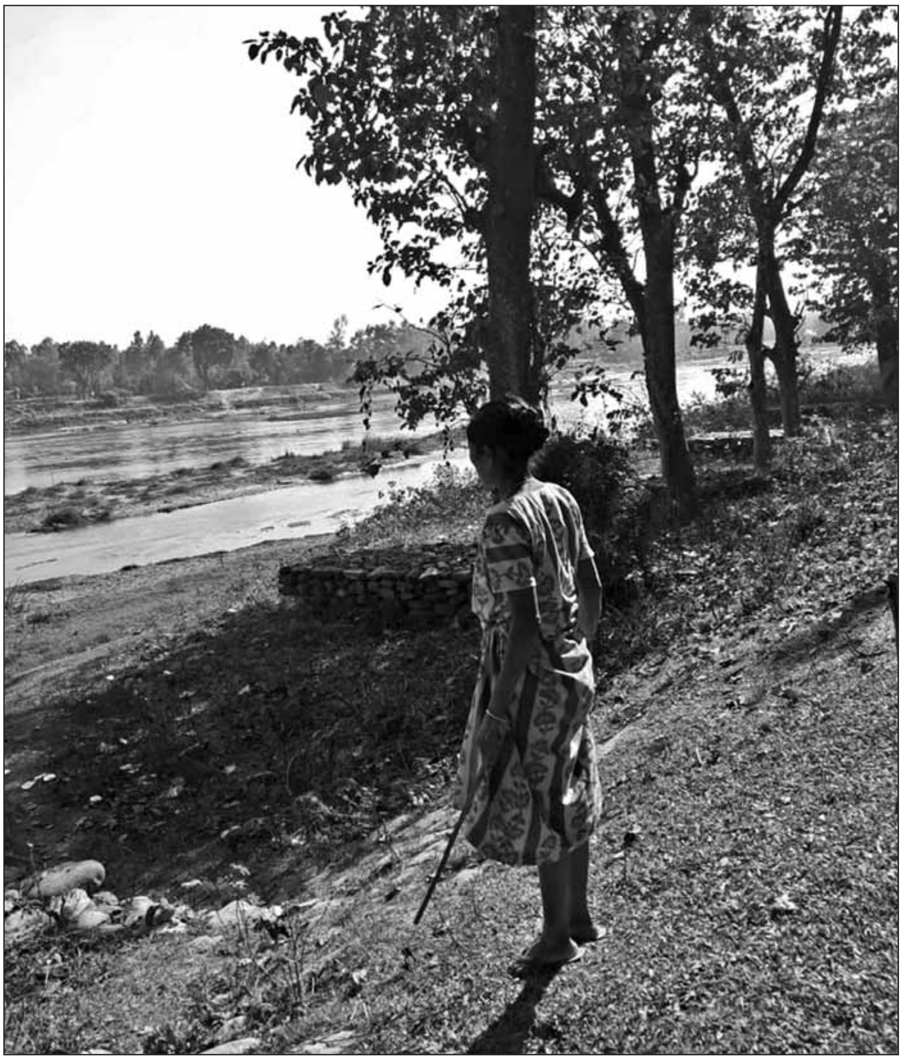

মহানন্দা নদীর এপারে ফাঁসিদেওয়া ওপারে বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া

আমার প্রথম কর্মজীবন শুরু হয় ফাঁসিদেওয়াতে। ১৯৭৮ সালের মে মাসে। এক বছর শ্রীনিকেতনে ট্রেনিং শেষ করে কোন্নগরের বাড়ির মা, ভাই, বোনদের ছেড়ে আসি ফাঁসিদেওয়াতে।

আমার প্রথমে খুব ভয় হচ্ছিল। একা থাকব কী করে? প্রথম জয়েন করার দিন আমার সেজদি ও ভাই গৌতম ছিল। জয়েন করার পর আমার সেজদির এক চেনা দিদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, আমিও ভরসা পেলাম।

ফাঁসিদেওয়ার বেসিক স্কুলের হেড মিস্ট্রেস অন্নপূর্ণা পালের বাড়ি ভাড়া নিয়ে আমার চলা শুরু। ফাঁসিদেওয়ার যারা খুব পরিচিত মানুষজন তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে নিলাম। যেমন সুশীল কুন্ডু মহাশয়, হর্ষবর্ধন দাস, বিলাস মন্ডল, মধু মন্ডল, বিনয় সাহা (উকিল) ও ডাঃ হরিনারায়ণ দাশগুপ্ত মহাশয়।

ফাঁসিদেওয়া বাংলাদেশের বর্ডারের পূর্ব দিকে মহানন্দা নদীর ওপারটাই বাংলাদেশের বর্ডার তেঁতুলিয়া। গরমকালে দুই পারের লোকজন মাঝে মধ্যেই পারাপার করত। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সবসময় থাকে। বর্ষাকালে কানায় কানায় পূর্ণ মহানন্দা দারুণ সুন্দর। এপার থেকে ওপারের লোকজন, বাস, ধান খেত, পাট খেত সব কিছুই দেখা যায়।

ফাঁসিদেওয়া গ্রামের অনতিদূরে হাঁসখাওয়া ও ভোজনারায়ণ চা-বাগান যেখানে অবস্থিত সেখানে একটি উঁচু টিলার উপর ফাঁসিকাঠ বর্তমান ছিল। এখানে ব্রিটিশরা অপরাধীদের ফাঁসিকাঠে ঝোলাতেন বলে জানা যায়।

ফাঁসিদেওয়া ব্রিটিশদের তৈরি। তখন শিলিগুড়ির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। বলা যায় গণ্ডগ্রাম। ফাঁদিদেওয়া থেকে স্থানান্তরিত মহকুমাটির নাম শিলিগুড়ি হল। ফাঁসিদেওয়াতে আদালত ছিল। শিলিগুড়িতে তখন আদালত ছিল না।

শিলিগুড়ি থেকে ফাঁসিদেওয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক দিন আগে গরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি ছিল। আমার আসার আগেই বাস যোগ হয়। মাত্র দুটি বাস সারাদিন চলত। এখনতো অনেক বাস। টোটো, অটো সবই বেড়েছে। ফাঁসিদেওয়াতে কোনও রেল স্টেশন নেই।

আমাদের অফিসের নাম ফ্যামিলি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার বোর্ডার এরিয়া প্রোজেক্ট। বিডিও-র অধীনে। এই প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের হাতের কাজ শেখানো, শিশুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস শেখানো সহ ছড়ার মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞান দেওয়া, পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা, নানা প্রকার খেলাধুলো শেখানো হয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরে মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ধর্মগ্রন্থ পড়ে শোনানো হত ও সুস্বাস্থ্য জীবনযাপনের পদ্ধতি, প্রসূতি পরিচর্যার বিষয়বস্তু অবগত করান হত।

সবটাই যেন আনন্দের সঙ্গে ও মনপ্রাণ দিয়ে করা হত।

বছরে খেলাধুলো, পিকনিক, ১৫ আগস্ট, ২৩ ও ২৬ জানুয়ারি পালন করা হত। লজেন্স, ফলমূল বিতরণ করা হত।

ফাঁসিদেওয়াতে রাজবংশী ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন বেশি। সবাই রাজবংশী ভাষাতেই কথা বলে। মানুষজন সরল প্রকৃতির। স্থানীয় মানুষের পেশা কৃষি। এদের মহিলাদের পোশাক ছিল বুকনি ও ছেলেদের লেংটি। ধীরে ধীরে পোশাকে পরিবর্তন এসেছে।

সুশীল কুন্ডুর তৈরি স্কুল

আমরা যখন প্রথম আসি তখন একটা কো-এডুকেশন হাইস্কুল ও একটা বেসিক স্কুল ছিল। এখন গার্লস হাইস্কুল, আরও হাইস্কুল, প্রচুর প্রাইমারি স্কুল হয়েছে।

স্কুলগুলি তৈরির পেছনে সুশীল কুণ্ডু মহাশয়ের অবদানই সব, তাঁর চেষ্টাতেই ফাঁসিদেওয়াতে বহু উন্নতি হয়েছে। ফাঁসিদেওয়ার উন্নতির জন্য তিনি অনেক ভাল কাজ করে গেছেন। কয়েক বছর আগে তিনি প্রয়াত হলেও এখানকার মানুষের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। গার্লস স্কুল ও আদিবাসী আবাসিক ও গার্লস স্কুল সুশীল কুণ্ডু মহাশয়ের হাতে তৈরি।

বর্ষাকাল ও শীতকালে ফাঁসিদেওয়াতে দারুণ সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। চারদিক সবুজ হয়ে ওঠে ধান ও পাটে। শীতকালে চারদিকে ফুলে ফুলে হলুদ হয়ে যায়।

ফাঁসিদেওয়ার মহানন্দা নদীর পূর্ব দিকে টিনের তৈরি একটি শিব মন্দির আছে। শিব চতুর্দশির দিন

সুশীল কুণ্ডু

গ্রামের মহিলারা দল বেঁধে পুজো দিতে আসেন।

হাটের পশ্চিমদিকে মুসলমানদের প্রার্থনার জন্য একটি টিনের চৌচালার মসজিদ আছে। প্রতি শুক্রবার মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা নামাজ পড়তে আসে এখানে।

সকাল-সন্ধ্যা মন্দিরের পুজো, উলুধ্বনি, ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি ও অন্যদিকে ভোর রাতে সুরেলা আজান ধ্বনিতে ফাঁসিদেওয়াকে মুখরিত করে রাখে। সে সময় মোবাইল, টিভি ঘরে ঘরে ছিল না। সবাই এতে খুব খুশি ও আনন্দ পেত।

ফাঁসিদেওয়া মোড়ে টিনের তৈরি একটি ছাপরাতে ভদ্রকালীর মন্দির আছে। প্রতিবছর জুলাই মাসের মাঝামাঝি পুজো হয় এবং এই উপলক্ষে বড় মেলা বসে। এখানে পাঁঠা ও কবুতর বলি দেওয়া হয়।

প্রতি বছর ধান রোপনের আগে আষাঢ় মাসের এক মঙ্গলবার গ্রাম পুজো অনুষ্ঠিত হয়। ফাঁসিদেওয়া এখন আধাশহরে পরিণত হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া তরাই অঞ্চলের একটি সুন্দর জনপদ।

পুনশ্চ ঃ মহানন্দা সেতুর ওপর তৃতীয় মহানন্দা সেতু তৈরির পর যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মসৃণ হয়ে ওঠে।

ঝর্ণা ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি ডায়েরি

পথের কুকুর হইতে সাবধান!

সময়টা আশির দশক, কিছুদিন হল এসেছি। বাড়িতে ঢুকে দেখি বেশ বড়সড় একটা কুকুর। বাড়িতে অনেক লোকজন বলে বেঁধে রাখা হয়েছে, নইলে এ বাড়িতে কুকুর বাঁধা হয় না। কিছুদিন পরে দেখি এ পাড়ার প্রায় সকলের বাড়িতেই কুকুর পোষ্য হিসেবে পালিত হয়। বোধহয় ওটাই স্টেটাস সিম্বল! তখন ছিল বাড়ি। বেশ খোলামেলা উঠোন বাগান নিয়ে টিনের চালের বাড়িগুলি ছিল দেখার মত। কালের দোহাই দিয়ে সেইসব বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে নতুন করে গড়ে উঠল তিন-চার মহলের ছোট ছোট কুঠুরি, ওই আদিখ্যেতা করে যাকে বলি হাইরাইজ-ফ্ল্যাট। স্কোয়ারফুট সমৃদ্ধ এইসব ঘরে কুকুর

দূরস্থান কোনও পোষ্যই ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারে না। যেসব বাড়িতে একদা কুকুর ছিল ভীষণ প্রিয় হঠাৎ দেখি সেসব ফ্ল্যাটবাড়ির সামনের বিশাল গেটের শোভা জলাঞ্জলি দিয়ে ঝুলছে নীল রং-এর প্লাস্টিকের বোতল। যাঁরা নীল বোতল জোগাড় করতে পারেননি, তাঁরা নীলরঙ মিশিয়ে দিয়েছেন জলে। একেকটি গেটে তিন-চারটে করে বোতল দড়িবাঁধা অবস্থায় ঝুলে আছে। কারণ জানতে চাওয়ায় শোনা গেল কুকুরের উৎপাত বন্ধ করার জন্য এই ব্যবস্থা।

সত্যিই তো! শহরের রাস্তায় দলে দলে কুকুর। তা থাক না তারা তাদের মত। যাবেই বা কোথায় কেষ্টর জীবেরা! ওড়িশার কটক ভুবনেশ্বরের মত জায়গায় দেখেছি ষাঁড়ের উৎপাত। বাপরে! রাস্তা যেন তাদের। শহর শিলিগুড়ির রাত শাসন করে পথকুকুর। তাদের একেকটা যেন ছোটখাটো নেকড়ে। কী তাদের চেহারা আর তাকানোর ভঙ্গী! যেন আগাপাশতলা জরিপ করে নিচ্ছে। রাত আটটার পর পথ চলে যায় তাদের দখলে। একেকটা দলে সাত-আটটা, কখনও তার চাইতেও বেশি। বাইকের স্পিড বাড়িয়েও তাদের দাঁত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, সাইকেল আরোহীরা তো শিশু! কতজনকে যে তাদের কামড়ের শিকার হতে হয়েছে। আর যারা পায়ে চলিয়ে, তাদের দুঃখের সীমা থাকে না রাত আটটার পর। নিজের পাড়া হলে হাতের লাঠিটাকে যাও বা সমীহ করে চৌমাথা পেরিয়ে পাড়া বদলে গেলেই বন্ধু লাঠিটা হয়ে ওঠে ওদের আক্রোশের কারণ আর আক্রমণের উপকরণ। দু'পাশ থেকে কুকুর ছুটছে আর একটি মানুষ আর্ত চিৎকার করে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটছে এ দৃশ্য এখন এই শহরে পরিচিত।

তবু প্রশাসনের টনক নড়ে কি? এদিকে সদর হাসপাতালে অ্যান্টি রেবিস ভ্যাকসিনের অভাব। দৌড়তে হয় নার্সিংহোমে। তার দাম জোগাড় করতে ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা হয়। মাঝে দেখেছিলাম কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নানাভাবে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়েছিল। যাতে সারমেয় বৃদ্ধি না হয় অথবা তাদের কামড়ে যাতে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর জলাতঙ্ক রোগ না হয় তার জন্য তারা চেষ্টা চালিয়েছিল। হয়ত কালের স্রোতে তাতে পলি পড়েছে।

প্রশাসনের তরফ থেকেও যেমন তেমনি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিও তৎপর হলে পথ-কুকুরের দাপট কিছুটা কমতে পারে। মাঝরাতে পাড়া কাঁপিয়ে এলাকা দখলের লড়াই থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, অনেকেই এদের রাত প্রহরী হিসেবে ভালোবেসে উচ্ছিষ্ট খেতে দেন, অনেকে আবার গ্রহমুক্তির পরিত্রাতা হিসেবে এদের বিস্কিট খাওয়ান। সে করা যেতেই পারে, এসব তো আপত্তিজনক নয় মোটেও, কিন্তু ওই যে নিজেদের খাবার খুঁজতে গিয়ে তারা গার্বেজ বিনগুলি উলটেপালটে দেয়, ফ্ল্যাটবাড়ির চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে নোংরা আর তার থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে ঝুলতে থাকে নীল বোতল; এই ভুলভাল পদ্ধতি বদলে ফেলে সাধারণ গৃহীদেরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিৎ।

মহাপ্রস্থানের পথে যে প্রাণীটি পান্ডবদের সঙ্গী হয়েছিল, যে প্রাণীটি সত্যিই প্রভুভক্ত অথবা একজন ভাল বন্ধুর ভূমিকা পালন করতে পারে, তার রক্ষণাবেক্ষণ যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি তাদের উৎপাত থেকে পথচারীদের বাঁচা। শুধু একটু সচেতনতা চাই। সাধারণ মানুষ এটুকু দাবি প্রশাসনের নির্দিষ্ট দপ্তরে রাখতেই পারেন, তাই না?

শ্যামলী সেনগুপ্ত

পাঠকের কলমে শিলিগুড়ি

ফিনিক্স পাখির মত জেগে উঠবে ‘অনিন্দ্য’?

‘এখন ডুয়ার্স’ ডিসেম্বর ২০১৮ সংখ্যায় বন্ধুবর ধ্রুবজ্যোতি বাগচীর লেখা পত্র প্রতিবেদন ‘সেই সব দিন রাত্তির’ পড়ে আমারও কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। সে সময় আমরা কয়েক জন কলেজের পাঠ শেষ করে, টিউশনি, চাকরির দরখাস্ত পাঠানোর পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাতেও মন দিয়েছিলাম। শিলিগুড়ি থেকে সে সময় আসমুদ্র হিমাচল, বালুকা, ঝিনুক, পাহাড়তলী ইত্যাদি পত্রিকা মোটামুটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের লেখাও সে সব পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। এর মধ্যে ‘পাহাড়তলী’ আমাদের ব্যাপারে একটু উন্নাসিক ছিল। আমরা কয়েক বন্ধু ঠিক করলাম আমাদের নিজেদের একটা নিজস্ব কাগজ দরকার।

সকালের টিউশনি সেরে আমরা সবাই বিধান মার্কেটের আপ্যায়ন নামে একটা চা-মিস্টির দোকানে আড্ডা মারতাম। দোকানটির কর্ণধার আনন্দদা আমাদের জন্য আলাদা একটা বসবার জায়গা করে দিয়েছিলেন। প্রায় অন্ধকার সেই ঘরে মিষ্টি তৈরির পাশাপাশি কয়লা ঘুটে ইত্যাদিও মজুত থাকত। একটা হলুদ টিমটিমে বাল্ব জ্বলত। সেই আলোতে আমারা আমাদের নিজেদের লেখা পড়তাম, অন্য পত্র পত্রিকা পড়তাম। আলোচনা করতাম। সে সময় দেশ পত্রিকায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘যাও পাখি’ আলোড়ন তুলেছে। তা নিয়ে আমাদের তুমুল আলোচনা চলত। আমরা নিজেদের লেখা পড়তে পড়তেই সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের নিজেদের একটা কাগজ হবে। নাম ‘অনিন্দ্য’। নামটা ধ্রুবই ঠিক করে দিয়েছিল। প্রথম সংখ্যার জন্য লেখা সংগ্রহ করা হল। ছাপা হল। প্রচ্ছদ করেছিলাম আমি। আকাশবাণী থেকে পত্রিকা নিয়ে আলোচনার সময় বলা হল, শিশুদের নামতা মুখস্ত করার ধারাপাতের মত প্রচ্ছদ। কিন্তু শিলিগুড়িতে সাড়া জাগিয়েছিল আমাদের ‘অনিন্দ্য’।

‘অনিন্দ্য’র আসরে নিয়মিত যোগ দিতেন গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য, পিনাকী চৌধুরী, পিনাকী ভট্টাচার্য, ধ্রুবজ্যোতি বাগচী, নারায়ণ দাস, অশোক বাগচী, সঞ্জয় দত্ত। আমি চাকরি পেয়ে মেদিনীপুর চলে যাওয়ায় ‘অনিন্দ্য’ বেশ কয়েকটি সংখ্যা মেদিনীপুর থেকেও ছাপা হয়েছিল। সেখানে ‘অমৃতলোক’ পত্রিকার সমীরণ মজুমদার আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। সমীরণ বর্তমানে প্রয়াত। খুব মনে পড়ে ওর কথা। প্রতি বছর পচিশে বৈশাখ রবীন্দ্র সদনে যাওয়ার জন্য আমি মেদিনীপুর থেকে পত্রিকা নিয়ে ভোরবেলা রবীন্দ্রসদনে পৌঁছে যেতাম, দার্জিলিং মেল ধরে শিলিগুড়ি থেকে আসত ধ্রুবজ্যোতি, নারায়ণ। আমরা তিন বন্ধু ‘অনিন্দ্য’ ও সমীরণ ওর ‘অমৃতলোক’ বিক্রি করতাম।

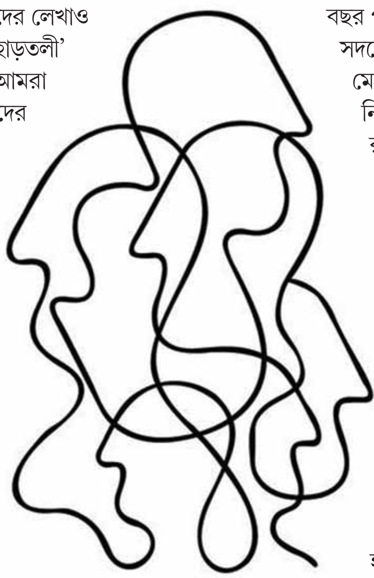

ধীরে ধীরে কালের নিয়মে আমি খড়গপুর আইআইটিতে থিতু হলাম, ধ্রুব বারাসতে, পিনাকী বহরমপুরে, সঞ্জয় মীরাটে, আরেক পিনাকী সিঙ্গাপুরে— সবাই ছড়িয়ে পড়লাম। ‘অনিন্দ্য’ অনিয়মিত হয়ে পড়ল। গত ত্রিশ বছরে একটি সংখ্যাও প্রকাশিত হয় নি। তবে আশার কথা শেষ সংখ্যাও এখনও বের হয় নি। কী জানি ‘ফিনিক্স’ পাখির মত আবার কোনওদিন ডানা ঝাপটিয়ে আকাশে উড়তে পারে কিনা।

বিমান কুমার ঘোষ
ভক্তি নগর, শিলিগুড়ি

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান
হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে।

জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১।

অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে

editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা

পরিবেশ। পরিকাঠামো। পর্যটন
জঙ্গল। জনসত্ত্বা
শিক্ষা। স্বাস্থ্য। সাহিত্য। সংস্কৃতি

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

সভ্যতা থেকে মুখ লুকাচ্ছে গোসানীমারির গড় !

“দীর্ঘ প্রস্থে যেকই সম হল যেক ছার মাটি।
তিন ছার মাটিয়ে বান্ধ করি পরিপাটি।।
কোদাল ধরিয়া মাটি কাটে শিষ্যগণ।
দশদন্ড মধ্যে হৈল গড়ের নির্মাণ।।
গড় বান্ধি বিশ্বকর্মা নিরীক্ষণ করে।
উচ্চ হৈল গড় আকাশক্ ধরে।।
দুয়ার না হইলে গড় মরণ সমান।
যাতায়াত কিমতে হবে সৈন্যসেনাগণ।।”

গোসানীমারির পথে কান পাতলে শোনা যায় দেব বিশ্বকর্মা ও তার অনুচরদের কীর্তিকাহিনি। দেবী চণ্ডীর আদেশে তারা এক রাতে কামতা রাজ্যের রাজা কাম্‌তেশ্বর বা কান্তেশ্বরের দুর্গ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। প্রথমে তারা সুউচ্চ মাটির গড় নির্মাণ করে রাজধানীকে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করেন। পরে রাজপ্রাসাদ ও নগর নির্মাণে মনোযোগী হন। রাত শেষে ‘কোদাল ধোয়া দিঘি’তে সবাই কোদাল ধুয়ে স্বর্গের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

দিনহাটা শহরের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শুরু করে পশ্চিমে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথ এগিয়ে গেলে জেলা সড়কের পাশে মাঝে মাঝেই দেখা মেলে এই গড়। এযুগের মানুষের লোভের আগুনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই গড়।

পঞ্চদশ শতাব্দর শেষভাগে গৌড়ের নবাব হুসেন শাহ তার রাজধানী নিষ্কন্টক করতে রাজধানী কামতাপুর (গোসানীমারি) দুর্গ আক্রমণ করেন। তার সৈন্যদল কয়েকটি আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত করা হয়। স্থলবাহিনী বাঙালি ও মানস নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত ফতেপুর দুর্গ দখল করেছিল। ধরলা নদী পথে তারা এসেছিল। তো সৈন্যদল গড়ের বাইরে এসে তাঁবু গেড়েছে। বহু চেষ্টা করছে। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে পারছে না। পারবে কী করে? গড়ের দ্বার সংখ্যা খুব বেশি নয়। ধর্মদুয়ার, অক্ষয়দুয়ার, জয়দুয়ার, শিলদুয়ার ইত্যাদি। পাথরে তৈরি তার কপাট। শালখুঁটি, লোহা ইত্যাদিও দুয়ার সুরক্ষায় ব্যবহৃত হয়েছে। তার উপরে আছে গড়খাই বা পরিখা। এগুলি জলপূর্ণ। সৈন্যদল দুয়ারে পাহারারত। সৈন্যদলের পদচারণা, আস্ফালন আটকে থাকে গড়ের বাইরে। কথিত ১২ বছর ধরে

ধ্বংস কবলিত কামতাপুর (গোসানিমারি) গড়, ছবি অভিজিৎ দাশ

সিংগিমারি নদীর কবলে, ছবি আমিনুল আলি

দুর্গ অবরোধ করে থাকলেও ভিতরে ঢোকার রাস্তা মেলেনি। অবশ্য একথা ইতিহাসসম্মত নয়। তবে বাধা যে বড় ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরে রাজমন্ত্রী শশী পাত্রের সহায়তায় নারীর ছদ্মবেশে গড়ের ভিতরে ঢোকার পথ মেলে।

'গোসানী-মঙ্গল' পুঁথি এক পুরুষের রাজত্বের কথা বলে। এই রাজা কান্তেশ্বর আসলে নীলাম্বর। তার আগে আরও দুই পুরুষ নীলধ্বজ ও চক্রধ্বজ খেন (Khen) বংশীয় রাজা হিসেবে এখানে শাসন করেন। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৫৮ বছর (সম্ভবত) ধরে এই তিন রাজা রাজত্ব করেন। অবশ্য এখানের ইতিহাস আরও প্রাচীন। কামরূপের পাল বংশের ষষ্ঠ রাজা ধর্মপাল (রাজত্বকাল ১০৯৫-১১২০ খ্রি) কামতাপুরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। আবার বৈদ্যদেব প্রথম এখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বলে আর একটি অভিমত আছে। তিনি ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এছাড়া সন্ধ্যারায়, দুর্লভনারায়ণ প্রমুখের রাজধানীও ছিল কামতাপুর। আখ্যান কাব্য গোসানীমঙ্গল দেব বিশ্বকর্মার কথা বললেও বাস্তবে এই রাজাদের মধ্যে কোন রাজার সময়ে গড় নির্মিত হয় তা জানা যায় না। যদি রাজা নীলাম্বরও গড় নির্মাণ করে থাকেন তবে এর বয়স সাড়ে পাঁচশো বছর হয়ে গেছে।

কিন্তু এরকম এক ঐতিহাসিক গড় হেরিটেজ হিসেবে সংরক্ষিত হওয়ার পরিবর্তে অস্তিত্ব সমস্যায় ধুঁকছে। প্রাকৃতিক শক্তি যার অস্তিত্বকে সংকটে ফেলতে পারেনি তা মানুষের শক্তির কাছে বিপন্ন। দিনহাটার পাশে বুড়িমায়ের মন্দির থাকায় গড়ের সামান্য অংশ আছে। সেখান থেকে আলোকঝাড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৭-৮ কিলোমিটার অংশে গড় ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। এরপর মাঝে মাঝে অল্প স্থান জুড়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে গড়। আজকের সিঙ্গিমারি নদী পেরিয়ে আদাবাড়ি, শিলদুয়ার থেকে শীতলকুচি ব্লকে এখনও গড় অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে। সিঙ্গিমারি নদী

আখ্যান কাব্য গোসানীমঙ্গল দেব বিশ্বকর্মার কথা বললেও বাস্তবে এই রাজাদের মধ্যে কোন রাজার সময়ে গড় নির্মিত হয় তা জানা যায় না। যদি রাজা নীলাম্বরও গড় নির্মাণ করে থাকেন তবে এর বয়স সাড়ে পাঁচশো বছর হয়ে গেছে। কিন্তু এরকম এক ঐতিহাসিক গড় হেরিটেজ হিসেবে সংরক্ষিত হওয়ার পরিবর্তে অস্তিত্ব সমস্যায় ধুঁকছে। প্রাকৃতিক শক্তি যার অস্তিত্বকে সংকটে ফেলতে পারেনি তা মানুষের শক্তির কাছে বিপন্ন।

গর্ভে আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে। এবারের বর্ষায় এই প্রতিবেদক জলের তোড়ে গড় ভেঙে পড়তে দেখেছেন প্রতিদিন। কিন্তু এ বিষয়ে কর্তাদের কোনও হেলদোল নেই।

ত্রিশ বছর আগেও দিনহাটা থেকে গোসানীমারি যাওয়ার পাকা সড়কের পাশে বিস্তৃত গড় দেখা যেত। এখন সেখানে বাড়িঘর উঠেছে কিংবা চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে গড়কাটা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসন দু'দিন নজরদারি করেই ক্ষান্ত হয়েছে।

অপরদিকে বাড়িঘর তৈরির জন্য মাটি গড় থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে। গড় কেটে রাস্তার পর রাস্তা হচ্ছে। কৌশলে গড়ের পাশের জমিগুলিতে গর্ত করে মাটি তুলে নেওয়া হচ্ছে। ফলে গড়ের মাটি আলগা হয়ে ভেঙে পড়ছে। এরপর একসময় সমবেত কোদালের ঐকতানে গড় ভেঙে খান খান। গড়ের মাটি ধসে কখনও বেরিয়ে এসেছে কামানের অংশ, কখনও দেবী মূর্তি। এক কথায় পুরাতাত্ত্বিক উপাদানের সন্ধান মিলেছে গড় বা সংলগ্ন জমিতে।

কামতাপুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজপ্রাসাদ উঁচু ঢিবির আকারে রয়েছে। এই এলাকায় ঢিবিটির পরিচিতি 'রাজপাট' হিসেবে। এই রাজপাট খনন করে ঐতিহাসিক নিদর্শন বের করে আনার দাবি ছিল দীর্ঘদিন ধরে। ১৯৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে রাজপাটে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া খনন কার্য চালায়। দুটি ইঁদারা সদৃশ অংশ এবং ইঁটের দেয়ালের অংশ বেরিয়ে আসে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে কী কারণে খনন কাজ বন্ধ হল তা জানা যায় না। রাজপাটের পাশে একটি পাকা ঘর নির্মাণ করে রাজপাটের উপরে পড়ে থাকা পাথরে করা মূর্তি কয়েকটিকে ওই ঘরে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। তবে এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভাল নয়। এখানে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলার দাবি উঠেছিল। কিন্তু কারও হেলদোল নেই। 'আত্মবিস্মৃত বাঙালি' ঐতিহ্য ও ইতিহাস সচেতন নয়। তাই ঐতিহাসিক বস্তু সংরক্ষণে তাদের আগ্রহ নেই বললেই চলে।

সম্প্রতি রাজপাটের পাশে মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে পাথরের বড় বড় থালা, বাটি, রেকাবি, শিবলিঙ্গের গৌরীপট সাদৃশ্য পাথরের জিনিসপত্র। রাজপাট সংলগ্ন ঘরটিতে এগুলি রাখা হয়েছে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কয়েকটি পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে গেছে। গর্তে আরও অনেক পুরাবস্তু আছে। এখানে পাহারা বসেছে।

হেরিটেজ ধ্বংসের এই খেলা কি শেষ হবে? নাকি হেরিটেজই হারিয়ে যাবে চিরতরে? উত্তর প্রজন্মকে কে দেবে এর উত্তর?

অভিজিৎ দাশ

লাল ইট আর জ্যোৎস্না রঙা গন্ধ

নীল পর্দাটা দুলছে। মৃদু বাতাস ওর সাদাটে বর্ডারগুলোয় আঁকিবুকি কাটছে ঠিক নমিতাদির ড্রইংক্লাসের পেনসিল স্কেচের মত। সোয়া দশটায় ওই ছিমছাম লাল ইট কাঠে তৈরি পাকা দালান আর দরজার দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে পলক না ফেলে হাঁটছিল ওই লালচে কোয়ার্টারে বিপরীতমুখী সুনীতি একাডেমির ছাত্রীরা। স্কুলের বড় গেটটা এক্ষুনি ওদের ঢুকিয়ে দিয়ে বন্দী করে নেবে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত। কখনও ওই প্রত্যাশী চোখগুলো চিক্ চিক্ করে উঠত। দেখা যেত নীল পর্দা উঠিয়ে ধবধবে সাদা পোশাকে সস্তাপাড় শাড়িতে বেরিয়ে আসছেন বড়দিমণি শোভনাদি। শান্ত সৌম্য ফরসা মুখে ফুটে উঠতে দেখেছি উজ্জ্বলতা। লাল কোয়ার্টার তাই স্বপ্নেই থেকে গিয়েছিল। নীল রঙের ওপারে অন্দরমহলটির জন্য ছিল প্রবল আগ্রহ। সে রহস্য ছাত্রীরা বছরের পর বছর সমাধান করতে পারে না। চলে যায় স্থানান্তরে।

বাড়িটি শুধুই রাজ আমলের সাক্ষী হয়ে বারংবার মহারাণী সুনীতি দেবীকেই মনে করিয়ে দেয়। ফি বর্ষায় আবার গভীর জঙ্গলে তক্ষক বাসা বাঁধে। গ্রিল গেটের হলদেটে রং চটে যায়। মজবুত জানলার কাঠ নড়বড়ে হয়, আর নতুন করে রং করা লাল ইটের দেয়ালে নোনা ধরে, তোরণে মরচে পড়ে। অদ্ভুত কারুণ্যে আমাকে ধরে কেউ নাড়িয়ে দেয়, বলে সেই নীল পর্দার রহস্য আজও ভেদ করতে পারলে না!

ওপরে পাঁচিল ওঠার আগে, নিচে বর্তমানে পাঁচিল ঘেরা

বহু যুগ পেরিয়ে স্কুল পেরিয়ে কলেজ, ইউনিভারসিটি পেরিয়ে চাকরি আর প্রায় বত্রিশ বছর পর ফিরে এসে একইরকম উৎসাহী চোখ খুঁজে ফেরে অন্দরমহলের গোপন রহস্য। নীল পর্দার ওপারে বড়দিমণিদের বিচরণ আর আলাপনের আদ্যপ্রান্ত। কিন্তু হাহাকার আসে বুক জুড়ে। কোথায় সে লাল ইট! কোথায় সে বাঁধানো তোরণ। সেখানে ভাঙাচোরা খণ্ডহর জেগে আছে গভীর নিবিড় জঙ্গলের ভিতর। উষ্মা জমতে থাকে বুক জুড়ে অন্তহীন। রাজআমলের মহারাণী সুনীতিদেবীর অনুগ্রহে যে বাসস্থানে কাটিয়ে গেছেন নামীদামী প্রধানেরা, বিচরণ করে শান্তি পেয়েছেন গাছপালা বাগান সংলগ্ন ভিতরের উঠোনটুকুতে, কামিনী বকুলের গন্ধ বুক জুড়ে শান্তির ছায়া মেলেছিল যেখানে তাঁদের স্বপ্নছায়া শুধু লেগে আছে সে সময়ের ছাত্রীদের চোখে মুখে বুকের ভেতর। সে সময়ের কয়েকজন মানুষের চোখেও। কখনও তীব্র ক্ষোভও প্রকাশ পেয়েছে কারও কারও কলমে। সে ক্ষোভ ভালবাসার, অতীতচারিতার, শ্রদ্ধার। সেইরকম এক মন নিয়েই বোধহয় আমার পূর্বতম প্রধান ওই স্কুল-সম্পত্তি রক্ষা করে স্কুলের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হেরিটেজ হোম বলে সে খণ্ডহরে হাত দিয়ে প্রসেনিয়াম বা ওই জাতীয় উপযুক্ত বিল্ডিং তিনি তৈরি করতে পারেন নি। হেরিটেজ রক্ষাকারীরা এ ব্যাপারে বড় কঠিন। তাই সে খণ্ডহর রাজনগরের রাজ আমলের বৈশিষ্ট্য বহন করে বিরাজিত। তবে এ কাঠিন্য রাজনগরের সর্বত্র অবশিষ্ট নেই, শুধু এই খণ্ডহরের বেলাতেই বা কেন, এখন ভাবি।

আমি এলাম, ভাবলাম কোচবিহারের মেয়ে... নীল পর্দার অন্দরমহলের আঁটঘাট দেখি না— যা দেখতে চেয়েছি ছাত্র অবস্থায় কতবার নতুন করে বিলুপ্ত প্রায় খণ্ডহরকে আবিষ্কার করার চেষ্টা এবার।

সহায়তা দরকার। অগত্যা গভর্নমেন্ট বাস্তুকারের তলব, রিকুইজিশন, লে আউট, সেই হারিয়ে যাওয়া প্রধানাদের পদচিহ্ন মেলে ধরার চেষ্টা, ওই নীল পর্দা ধরে না হয় বর্তমান মুখচ্ছবিই দেখুক রাজনগরের মানুষরা। এখনকার সবুজ সাদার ছাত্রীরা সেই একই আবেগে রাস্তা ধরে এগনোর সময় ফাঁক ফোকর গলে যে উষ্ণতাটুকু, সে গন্ধটুকু খুঁজে নিক। ...কিন্তু হল না বুঝি আর শেষরক্ষা। হারিয়েই গেল সে স্বপ্নচারণের কথকতা।

বিল্ডিং সেই লালচে শক্ত ইটেই বহাল তবিয়তে নিজস্ব বনিয়াদেই নতুন করে তৈরি হল। জঙ্গল সাফ হল। অনধিকারীদের রাতের অন্ধকারে আসাযাওয়া বন্ধ করার জন্য তালা চাবির ব্যবস্থা হল। প্রাচীরঘেরা হল। বর্তমান প্রধানের সঙ্গে ভিতরের বাগান কেমন হবে কোন দরজা খোলা থাকবে সে সব কল্পিত আলোচনা পর্যন্ত এগোল। কিন্তু খণ্ডহরকে পুনর্বাসনের উপযোগী করতে যে সামান্যতম এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সচল দরকার তা আর হল না। বন্ধ হয়ে যাওয়া ড্রেন আর চালু করা গেল না। নষ্ট হয়ে যাওয়া ইলেক্‌ট্রিফিকেশন অথবা জল পরিষেবা হাজার চিঠি লিখেও করা গেল না। বাড়িটি শুধুই রাজনগরের বিশেষত সুনীতি একাডেমীর রাজ আমলের সাক্ষী হয়ে বারংবার মহারাণী সুনীতি দেবীকেই মনে করিয়ে দেয়।

ফি বর্ষায় আবার গভীর জঙ্গলে তক্ষক বাসা বাঁধে। গ্রিল গেটের হলদেটে রং চটে যায়। মজবুত জানলার কাঠ নড়বড়ে হয়, আর নতুন করে রং করা লাল ইটের দেয়ালে নোনা ধরে, তোরণে মরচে পড়ে। অদ্ভুত কারুণ্যে আমাকে ধরে কেউ নাড়িয়ে দেয়, বলে সেই নীল পর্দার রহস্য আজও ভেদ করতে পারলে না!

সন্ধে ঘনায়। স্কুল গেট পেরিয়ে আবছায়া রাস্তার অন্ধকারে দেখি জঙ্গলে আবার ঢেকে যেতে যেতেও সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে সাদা শাড়ি আর সস্তাপাড়ের আমেজ। কালো পাম্প শু-র শব্দে এখুনি মচ্ মচ্ করে উঠবে লাল ইটের অদ্ভুত কুয়াশা মাখা তোরণ... গন্ধ উঠবে জ্যোৎস্নার।

ফিরতি পথে সে গানখানি গুণগুণ করলে কি দোষের হবে! ...'যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর...'

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

কচুরিপানায় প্রায় হারিয়ে গেছে চন্দন দিঘি

বিপন্ন পরিবেশ ? নাকি হেরিটেজ ?

দিঘির জলে কীসের সন্ধানে রাজনগর কোচবিহার ?

অক্টোবর মাস শেষ হতে না হতেই এবার হিমের পরশ পেতে শুরু করেছিল কোচবিহার শহর। হাল্কা শীতের ভোরে শান্ত সমাহিত সাগর দিঘির ঘুম তখনও ভাঙ্গে নি। এ রাজনগরের অন্যতম 'আইকন' ও আধুনিক জনগণতান্ত্রিক কোচবিহারের হেরিটেজ চর্চার গুরুত্বপূর্ণ এই ফোটোফ্রেম প্রহরে প্রহরে তার রূপ বদলায়। সন্ধ্যায় 'ফুড কোর্ট বুলেভার্ড', দিনের বেলায় 'এসপ্ল্যানেড', আর এসময় স্বাস্থোদ্ধারকারীদের 'জগার্স পার্ক'। শহরের প্রাচীন মানুষগুলির অলস পদচারণার মাঝে টুকটাক আলগা কথা কানে আসবেই। যেমন 'পাখি বোধহয় এবারও আর আসবে না', বা 'দিঘিতে দিনভর জাল দিয়ে মাছ ধরা তো আজকাল আর দেখতে পাই না', কিংবা 'সকালে কয়েক ঘন্টা দিঘির চারপাশে গাড়িঘোড়া চলাচল বন্ধ রাখা যায় না?' ইত্যাদি। সেদিন হঠাৎ কানে এল আরেক মন্তব্য - 'তিনমাস অন্তর একবার করে যদি মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারে আসেন, তাহলে সাগরদিঘির দিকে একটু তাকানো যায়।"

ঠিক তার কয়েকদিন আগেই দেড় দিনের সফর শেষে কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়াম থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে গেলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, আর তাঁর আগমনের কারণে রাতারাতি ভোল পালটে গেল কোচবিহারের। একদিনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল শহরের প্রাণকেন্দ্র সাগরদিঘিও। কাটাছাটা হয়ে গেল চারপাশের জঙ্গল ঝোপঝাড়, সরানো হল চারপাশের ফ্লেক্স ব্যানারের জঙ্গল, দিঘির জল থেকে তোলা হল বিস্তর আবর্জনা। অথচ মাসের পর মাস এই দিঘিই পড়ে থাকে দূষণের আদর্শ উদাহরণ হয়ে। আবর্জনা আর জঙ্গলে জর্জরিত সাগরদিঘির এহেন রাতারাতি ভোলবদলে মানুষ খুশি তো হবেই। এমন পরিচ্ছন্ন সাগরদিঘি যে কোচবিহারের মানুষ বহুদিন হয়ে গেল চোখে দেখে নি।

প্রাচীন ঐতিহ্যময় সব দিঘির শহর কোচবিহার। ইতিহাস বলে, কোচবিহারের প্রজাবৎসল মহারাজারা ছিলেন যথেষ্ট দূরদর্শী। তারা চিন্তা ভাবনা করেই পরিকল্পিত ভাবে এই দিঘিগুলি খনন করিয়েছিলেন। একটা সময় ছিল, যখন শহরের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা এই দিঘিগুলো ছিল পানীয় জলের উৎস। সেসময় প্রত্যেকটি দিঘিই বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, কোনওটা পানীয় জলের জন্য, কোনওটা শুভ অনুষ্ঠানের জন্য, কোনও দিঘি আবার শুধুমাত্র জামা কাপড় কাচার জন্যই বরাদ্দ ছিল। দিঘি পরিষ্কার সংস্কার সবই হত রাজকর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে। সাজানো গোছানো দিঘিগুলি একসময় মানুষের চোখকে আরাম দিত। এখনও তারা এই শহরের ফুসফুস। সে রামও নেই,

ফি বছর মৎসদপ্তর দিঘিগুলোকে লিজ দেন মাছ চাষের জন্যে। এবার চন্দন দিঘি লিজে রয়েছে অপূর্ব ফিস সেন্টারের নামে। কিন্তু এত পুরু কচুরিপানা ভর্তি দিঘিতে ঠিক কোন অলৌকিক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ হয় তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির বাইরে। যারা দিঘি লিজ নিয়েছেন তারা নিয়মিত কচুরিপানা পরিষ্কার করেন এমন কথা মৎসদপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হলেও বাস্তব চিত্র কি তাই বলে? আর জলের দূষণও যে সাঙ্ঘাতিক তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। অনেকেই এই দিঘির নামকরণ করেছেন 'হেরিটেজ বর্জ্যাগার'। উল্টোদিকেই জেলা হাসপাতাল, থুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল!

সে অযোধ্যাও নেই। দিঘিরা তাই এখন অভিভাবকহীন, শহরের ফুসফুস কঠিন রোগে আক্রান্ত!

দিঘি তুমি কার? নাথবতী অনাথবৎ

সরকারি ওয়েব সাইট ঘেঁটে এবং মৎস্য ও ভূমি দপ্তরে একাধিকবার গিয়ে আধিকারিকদের অনিচ্ছা ও সদিচ্ছার সম্মিলিত সৌজন্যে যেটুকু জানা গেল তা'হল— দুটি দিঘি কেবল দেবত্র ট্রাস্টের, এছাড়া সদরের ১১টি দিঘিরই একক মালিকানা মৎস দপ্তরের। রাজ্য সরকার কোচবিহার শহরকে সম্প্রতি হেরিটেজ ঘোষণা করার উদ্যোগ নিয়েছেন, ফলে শহরে হেরিটেজ দিঘিগুলির ঐতিহ্য রক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বেড়ে গিয়েছে কয়েকগুণ। কেজো লোকেদের যদিও এসব নিয়ে চর্চা করবার 'ফালতু' সময় নেই, কিন্তু যাদের হাতে অনেক অবসর তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, এইসব হেরিটেজ দিঘি রক্ষার দায়িত্ব কার, কতটুকু যত্নবান তারা এই দিঘিগুলোর প্রতি?

চন্দন দিঘি কোন বায়ু বয়ে আনে হাসপাতালে?

তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যে চন্দনবাঈ এর নামে নামকরণ্ঙ্ করা হয়েছিল একশ বছরেরও বেশি পুরনো এই দিঘির। একদিকে সিলভার জুবিলি রোড ও অন্যদিকে সুনীতি রোড। চন্দনের এখনকার অবস্থা দেখলে করুণা হবে। 'ওখানে আবার একটা দিঘি আছে নাকি?' রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করেন নতুন বদলি হয়ে আসা জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সত্যিই এই দিঘিকে এখন খুঁজে পাওয়াই চ্যালেঞ্জের। এক দিকে জেনকিন্স স্কুল, অন্যদিকে এবিএনশীল কলেজের বয়েজ হস্টেল, বাকি দুটো দিক এককালে ছিল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। ধীরে ধীরে শুরু হল পাড় দখল। একটা দুটো করে দোকান বসতে বসতে বর্তমানে দিঘিটি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছে। পুরু কচুরিপানায় ভরে আছে গোটা দিঘি, সাথে উপরি পাওনা হিসেবে জমে আছে চারিদিকের দোকানের সমস্ত বর্জ্য, প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ, কাঁচের শিশি, কাগজের পেটি। গত চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে পাড় জুড়ে গজিয়েছে যেসব ওষুধ, জামাকাপড়, খাবারের হোটেল, মিষ্টির দোকান, বইপত্রের দোকান, সেইসব শতখানেক দোকানের অলিখিত শৌচাগার। কাগজে কলমে ২"৩১০ একর থাকলেও বাস্তবে এই দিঘির পরিমাণ যে কত হয়ে আছে তা জানা সম্ভব নয়। কারণ, শেষ কবে দিঘিগুলি মাপা হয়েছিল তা কেউই সঠিক বলতে পারেনা।

পাড়ের দোকানগুলোর বেশ কিছু এখনও কাঠের প্ল্যাঙ্কিং। বাকিগুলি পাকা। অনেকেই ইচ্ছেমত দিঘির ভেতর ঢুকে গিয়ে নিজেদের ঘরের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে নিয়েছে। তারা এতগুলি বছর ধরে কোন শক্তিবলে ব্যবসা করে যাচ্ছে তা বোঝা অবশ্য কঠিন কিছু নয়। দোকানগুলো দিব্যি হাতবদলও হয় বেশ চড়া দামে। অ্যাসোসিয়েশনের পান্ডা জানালেন, এদের প্রত্যেকেরই নাকি বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। যদিও বহু চেষ্টাতেও সেই কাগজ চর্মচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয় নি। দিঘির পাড়ের এই জমির মালিক হওয়ার কথা মৎস্য দপ্তরের, তাঁদের সাফ কথা তারা কাউকে সে জমি লিজ দেয় নি। প্রশ্ন হল, জমির কোনও বৈধ কাগজ থাকুক বা না থাকুক তারা ঠিকঠাক পুরকর দেয় কি? তার পরিমাণ কত? দোকানের প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজপত্র না থাকলে এই দোকানিরা পুরসভার ট্রেড লাইসেন্স করেন কোন যাদুবলে?

ফি বছর মৎসদপ্তর দিঘিগুলোকে লিজ দেন মাছ চাষের জন্যে। এবার চন্দন দিঘি লিজে রয়েছে অপূর্ব ফিস সেন্টারের নামে। কিন্তু এত পুরু কচুরিপানা ভর্তি দিঘিতে ঠিক কোন অলৌকিক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ হয় তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির বাইরে। যারা দিঘি লিজ নিয়েছেন তারা নিয়মিত কচুরিপানা পরিষ্কার করেন এমন কথা মৎসদপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হলেও বাস্তব চিত্র কি তাই বলে? দিঘির পাড়ের দোকানদারেরাও বলেছেন কচুরিপানা কখনও পরিষ্কার হয় না। আর জলের দূষণও যে সাঙ্ঘাতিক তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। অনেকেই এই দিঘির নামকরণ করেছেন 'হেরিটেজ বর্জ্যাগার'। উল্টোদিকেই জেলা হাসপাতাল, থুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল! কারও কারও মনে হয়ত এমন প্রশ্ন জাগে - আচ্ছা, চন্দন দিঘির মারাত্মক দূষণ বছরের পর বছর ধরে যে কোটি কোটি ব্যাক্টেরিয়ার সূতিকাগার হয়ে উঠেছে তারা কি হাসপাতালের দরজা থেকে সাইনবোর্ড দেখেই ফেরত চলে আসে?

তাদের খাটা পায়খানা সব দিঘির জলের উপর মাচা বেঁধে করা, দিঘির জলে নির্বিচারে নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ, আবর্জনা তো ফেলা চলছেই নিয়মিত। সঙ্গে কচুরিপানার অবৈধ বিস্তার। তবে পুকুরের মাপ বের করবার চেয়ে অনেক সহজ দূষণের পরিমাপ করা, লোকে বলে, পরিবেশ মন্ত্রী খালি চোখে দেখলেই নাকি খাবি খেতে পারেন! মৎসদপ্তরের কথায়, মাছ চাষ করাটাই তাদের প্রথম এবং মূল কাজ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা তাঁদের এক্তিয়ারে পড়ে না। তবে মাছ চাষের লিজ দেওয়া আছে হাজরা পাড়ার জনৈক নিতাই দাসের নামে, এমন দূষিত জলে কোন কোন মাছের চাষ হয়, সেগুলি কোথায় যায়, তাও নির্বিকার নগরবাসীদের জানা উচিত নয় কি?

পূর্ব পাড়ে আজ আর কোনও রাস্তার অস্তিত্ব নেই। এলাকার মানুষের কথাতেই মেলে, পশ্চিম পাড়ে এককালে মাটি ফেলে তৈরি করা হয়েছিল কার পার্কিং। সেসময়ই বেশ কিছুটা ছোট হয়ে গিয়েছিল লালদিঘি। এবার তো দেখা যাচ্ছে বাঁশের বেড়া দিয়ে পাইলিং

অপরিষ্কার আবর্জনায় ভরা লালদিঘি

লাল দিঘির উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম।

ভবানীগঞ্জ বাজারের ঠিক দক্ষিণে রয়েছে এই লাল দিঘি। আয়তনে চন্দন দিঘির প্রায় তিনগুণ, মানে ছিল এককালে। কাগজে কলমে এখন দিঘির মাপ ৬"৪৭০ একর দেখালেও আদপে যে কতটুকু আছে তা বলতে পারবেন কি মৎস্যদপ্তর? পুরসভা? বা ভূমি রাজস্ব দপ্তর? কোচবিহারের পুরনো লোকজনের কাছে জানা যায়, শুধু লাল দিঘি নয়, ভবানীগঞ্জ বাজারের ঠিক মাঝখানেও একটি দিঘি ছিল। বাজারে আগুন লাগলে আপৎকালীন জল সরবরাহের প্রয়োজনের জন্য। সেই দিঘি তো কবেই দায়িত্ব নিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সম্ভবত বর্তমান মাছ বাজার। অতি কষ্টে টিকে আছে লালবাঈয়ের নামে উৎসর্গীকৃত এই লাল দিঘি। দখল হয়ে গেছে তার চারিদিকের পাড়। লাল দিঘির উত্তর পাড়ে একটি বাধানো ঘাট ছিল। দিঘির পাড় বন্ধ করে হোটেল দোকান বানানোয় সেগুলো সব ঢাকা পড়ে গেছে।

দক্ষিণ পাড় জবরদখলকারীদের পাকাপাকি দখলে, তাদের হটায় এমন বাপের ব্যাটা আছে কেউ এই বঙ্গে?

দক্ষিণ পাড় জবরদখলকারীদের পাকাপাকি দখলে, তাদের হটায় এমন বাপের ব্যাটা আছে কেউ এই বঙ্গে? তাদের খাটা পায়খানা সব দিঘির জলের উপর মাচা বেঁধে করা, দিঘির জলে নির্বিচারে নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ, আবর্জনা তো ফেলা চলছেই নিয়মিত। সঙ্গে কচুরিপানার অবৈধ বিস্তার। তবে পুকুরের মাপ বের করবার চেয়ে অনেক সহজ দূষণের পরিমাপ করা, লোকে বলে, পরিবেশ মন্ত্রী খালি চোখে দেখলেই নাকি খাবি খেতে পারেন! মৎসদপ্তরের কথায়, মাছ চাষ করাটাই তাদের প্রথম এবং মূল কাজ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা তাঁদের এক্তিয়ারে পড়ে না।

করে আরও মাটি ফেলা হল, মানে আরও কিছুটা ছোট হল। ঢালাইয়ের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে পুরসভা সেখানে বহুতল পার্কিং লট বানানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মালিক মৎস দপ্তরের সাথে নাকি এ বিষয়ে কোনওরকম পরামর্শই করা হয়নি পুরসভার পক্ষ থেকে? করবেই বা কেন বলেন? প্রশ্ন এক দোকানির, ওদের মাছ চাষে তো আর বাধা দেওয়া হয় নাই! শহরের ট্রাফিক সমস্যার সমাধানে অকামের ওই পুকুর সাইজে একটু ছোট হইলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় নাকি?

লালদিঘির পশ্চিম পাড়ের অর্থাৎ পার্কিং-এর দিকের রাস্তাটা অলিখিত হিসিখানা, স্থানীয় ডাকনাম মূত্রগলি-- আট থেকে আশি কেউ কুকুরকর্ম করতে ন্যুনতম লজ্জাবোধ করে না — শৌচাগার বানানোর ব্যাপারে কোচবিহার পুরসভার কৃপণতার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে অবশ্য আলাদা স্টোরি হয়ে যাবে। সান্ধ্যকালীন মদ-জুয়ায় আসরও চোখে সয়ে গেছে। গা ঘেঁসেই রয়েছে বাজারের বহু পুরনো মসজিদ, সেসবের তোয়াক্কা কেউ করে কি?

বৈরাগী দিঘির জলে উন্নয়নের তিন কোটি!

২১/০৯/২০১১ তারিখে নথি সংশোধন হয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধিকারে আসে সুনীতি দিঘি (বৈরাগী দিঘির পোষাকি নাম বা সরকারি নাম)। ৪,৪১০ একরের বিশাল এই দিঘি আপাতত লিজে। মদনমোহন বাড়ি সংলগ্ন এই দিঘিটির সৌন্দর্য এক সময় ছিল দেখবার মত। হিন্দু ধর্মে 'সাত ঘাটের জল' বলে একটা কথা আছে। এই বৈরাগী দিঘিতেই একমাত্র সাতটি ঘাট রয়েছে। তাই এই দিঘির জল পবিত্র হিসেবে মানা হয়। সেই কারনে সমস্ত মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠানে এই দিঘির জল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দেবত্র ট্রাস্টের আয় বাড়ানোর উদ্দেশে বৈরাগী দিঘিতে পর্যটন দপ্তর ও উত্তরবংগ উন্নয়ন দপ্তরের সহায়তায় একটি লাইট এন্ড সাউন্ড শো এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, সেখানে লেজার শোয়ের মধ্যে বৈরাগী দিঘির থেকে উঠে আসবেন বাঁশি হাতে মদনমোহন। দর্শকরা ২০ টাকার টিকিট কেটে জালের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে এই দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন। বহুদিন লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি পড়ে পড়ে, ঘাসে ঢেকে কার্যত নষ্ট হচ্ছিল আনন্দময়ী ধর্মশালা প্রাঙ্গণে। 'এখন ডুয়ার্স' সহ নানা পত্র পত্রিকায় বহু লেখালেখির পর দিঘিতে কাজ শুরু হয়। ২০১৭ র ৩ নভেম্বর রাসমেলার দিন উদবোধন করা হয় এই ফ্লোটিং ফাউন্টেনের। মজার বিষয় হল, যে আয়ের কারণে এই লেজার শোয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই আয় হওয়া তো দুরের কথা, উলটে ফাউন্টেন চালানোর এই বিপুল ব্যয় বহন করা নিয়েই দেখা দিল সংশয়।

বৈরাগীদিঘির এই প্রজেক্টের জন্য রাজ্য পর্যটন দপ্তর ২ কোটি আর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ণ দপ্তর সাড়ে ৩ কোটি টাকা দিয়েছিল। মোট সাড়ে ৫ কোটি টাকার এই প্রজেক্ট তেমনি আধখেচরা অবস্থায়। এত তড়িঘড়ি করে অর্ধসমাপ্ত এই ফাউন্টেন উদবোধনের কারণ সাধারণ কোচবিহারবাসীর কাছে স্পষ্ট নয়। বৈরাগী দিঘির দক্ষিণ পাড়ে পেভার্স ব্লক বসানো হয়েছে। বসানো হয়েছে বসার বেঞ্চ। কিন্তু কথা ছিল দিঘির চারপাশেই বসানো হবে এ ধরনের ব্লক ও বেঞ্চ। ছোট ছোট লাইট, এলইডি বাতি থাকবে সেই সাথে, থাকবে ছাতা। কিন্তু উদবোধনের পর গোটা বছর কেটে গেল, কাজ না হওয়ায় ইতিমধ্যেই

উদবোধনের পর গোটা বছর কেটে গেল, কাজ না হওয়ায় ইতিমধ্যেই পর্যটন দপ্তর নাকি তাদের দেওয়া ২ কোটি টাকা ফেরৎ নিয়ে নিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এখানে এখন পর্যন্ত অর্ধেকের বেশি কাজই বাকি পড়ে আছে। অথচ কোচবিহার বৈরাগী দিঘির সৌন্দর্যায়ন ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত কাস্টমাইজড শো অ্যাকুয়াস্ক্রিন তৈরিতে টাকা কিন্তু খরচ হয়ে গেছে বাজেটের ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। জানা গেল ফাউন্টেন চালানোর জন্য নাকি আজ পর্যন্ত কোনও ইলেক্ট্রিকের কানেকশনই নেওয়া হয় নি।

বৈরাগি দিঘিতে চলছে জামাকাপড় কাচা ও শুকনো

পর্যটন দপ্তর নাকি তাদের দেওয়া ২ কোটি টাকা ফেরৎ নিয়ে নিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এখানে এখন পর্যন্ত অর্ধেকের বেশি কাজই বাকি পড়ে আছে। অথচ কোচবিহার বৈরাগী দিঘির সৌন্দর্যায়ন ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত কাস্টমাইজড শো অ্যাকুয়াস্ক্রিন তৈরিতে টাকা কিন্তু খরচ হয়ে গেছে বাজেটের ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। জানা গেল ফাউন্টেন চালানোর জন্য নাকি আজ পর্যন্ত কোনও ইলেক্ট্রিকের কানেকশনই নেওয়া হয় নি। এই ফাউন্টেন চালাতে নতুন ট্রান্সফর্মার বসিয়ে ইলেক্ট্রিক নিতে হত। কিন্তু সেই টাকা কোন দপ্তর দেবে তার টানা পোড়েনে আজ পর্যন্ত সেই কানেকশন নেওয়া যায় নি। ফলে শো চালানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে জেনারেটর। তার তেলের যোগান দিতে নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। অথচ সেখানে পাহারা দেবার জন্য লোক রাখতে হয়েছে, যাতে অত দামী যন্ত্রপাতি চুরি না হয়ে যায়। আর তার জন্য মাসে মাসে ডি এম-এর ট্যুরিজম সেল থেকে নাকি ১৮ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, উদবোধন হওয়ার পর গত একবছরে এটি তিন-চার বার চলেছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই ফাউন্টেন নিয়মিত না চালালে জলের নীচে থাকা যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে বলে জানালেন এক আধিকারিক। তিনি বলেন, এটি ১৫ দিনে অন্তত একদিন চালানো খুব জরুরি, নইলে মোটরে শ্যাওলা ধরে যাবে। জেনারেটর চালানোর জন্য ২০০ লিটার তেল প্রয়োজন। এজন্য খরচ হবে প্রায় ১৬ হাজার টাকা। এই টাকা কে জোগাবে তা কারও জানা নেই। বৈরাগী দিঘির সামনে গেলেই দেখা যায়, জায়গায় জায়গায় সবুজ নেট ফেটে গেছে। চারদিক ঢাকার সবুজ

সাগরদিঘিতে অব্যাহত গণ স্নান

কাপড়ও ছিঁড়ে ঝুলছে। রেলিং জুড়ে জামা কাপড় মেলা। দিঘির চারিদিকে জঙ্গলে আর আবর্জনায় ভরা, দিঘির পশ্চিম পাড়ে রাস্তার পাশে অস্থায়ী দোকানের সারি। এসব দেখলে ইদানিং বহুশ্রুত 'হেরিটেজ' শব্দটা খানিক টাল খেয়ে যায় না? নতুন প্রশাসনিক আধিকারিক যারা এসেছেন, তাঁরা এখনও সঠিক বলতে পারছেন না এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কী! তাঁরা প্রকান্তরে মেনেই নিচ্ছেন বৈরাগী দিঘির জলে ইতিমধ্যেই সলিল সমাধি ঘটেছে প্রায় তিন কোটি টাকার। সান্ধ্য আলোছায়ার লেজার শিল্পে মদনমোহন ঠাকুরের বাঁশি হাতে উঠে আসবার সম্ভাবনা অতীব ক্ষীণ।

ফের সাগর দিঘির কথা। শহরের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে এই সাগর দিঘি। আয়তন ১৩"৫৮০ একর। দিঘির উত্তরে কোর্ট চত্বর। দক্ষিণে পুলিশ সুপারের অফিস ও পুরসভা। পূর্ব দিকে মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর। পশ্চিমে রয়েছে খোদ জেলাশাসকের করণ। এই সাগর দিঘি কোচবিহারের অন্যতম আকর্ষণ। বলতে গেলে দিঘির শহরে এক্কেবারে হাই প্রোফাইল দিঘি। দিঘিটি এতদিন SNCADA নামে কলকাতার একটি এনজিও-র নামে লিজ দেওয়া ছিল। সদ্য তাদের লিজের মেয়াদ শেষ হয়েছে।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ১৮০৭ খ্রী (১২১৪ বঙ্গাব্দ) এটি খনন করেন। নাম ছিল মেদিনী সাগর। এর আগেও এই জায়গায় একটি দিঘির অস্তিত্ব ছিল বলে গবেষকরা জানান। যাই হোক, পরবর্তীতে হরেন্দ্রনারায়ণ সাগর দিঘিকে আরও বড়, আরও গভীর করে খনন করেন। সংস্কারের পর সেই দিঘি পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত হয়। কিন্তু এক সময় দেখা যায়, সাগর দিঘির জলে গরু মোষ এমন কি হাতিকেও স্নান করানো হচ্ছে। সে সময় সাগর দিঘির জল যেমন নোংরা হয়ে গিয়েছিল, তেমনি আগাছায় ভরে গিয়েছিল চারধার। ১৮৬৫ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময় সাগর দিঘিতে স্নান নিষিদ্ধ করেন কর্নেল হটন। এই সময় দিঘি সংস্কার করে তা জনসাধারনের পানীয় জলের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সেটা ১৮৭৪ সাল। এত কিছুর পরেও আবার এক সময় সাগর দিঘির জল পানের অযোগ্য হয়ে যায়। সে সময় কিছুদিন বৈরাগী দিঘির জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করেছিল কোচবিহারবাসী।

সৌন্দর্যায়নের নামে সাগর দিঘিকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট বহু বছর ধরেই শুরু হয়েছে। শহরের মধ্যে সাগর দিঘির স্থান সব চাইতে উঁচু জায়গায়। অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মত। বাইরের কোনও জল সাগর দিঘিতে ঢুকতে পারত না। চারদিক দিয়ে ড্রেন কাটা ছিল, ফলে বৃষ্টি হলে সাগর দিঘির অচারপাশে কখনও জল দাঁড়াত না। আর দিঘির উদবৃত্ত জল বে করে দেবার জন্য এর উত্তর পশ্চিম দিকে একটা পাইপ ছিল। বছর কয়েক আগে অপরিকল্পিত ভাবে বাইরে থেকে ড্রেন কেটে দেওয়া হয় সাগর দিঘির মধ্যে। এই হটকারী সিদ্ধান্তে বাইরের নোংরা জমা জল সাগর দিঘির মধ্যে ঢুকতে শুরু করে। পরে অবশ্য সেই ড্রেন বন্ধ করতে বাধ্য হন তৎকালীন পুরপ্রধান। প্রথম থেকেই সাগর দিঘির চার পাশ ছিল উন্মুক্ত। পারে বসার জন্য ছিল লোহার বেঞ্চ। আর সবুজ ঘাসে ঢাকা পাড় ঢালু হয়ে নেমে দিঘির জল ছুঁতো। সাগর দিঘির পাড়ে সেই বেঞ্চে বসেনি এমন মানুষ কোচবিহারে বিরল। পরবর্তীতে সেই রাজ আমলের লোহার বেঞ্চ সরে গিয়ে জায়গা নিলো সিমেন্টের বেঞ্চ। এরও কিছু পরে হল রঙ্গিন ছাতা দিয়ে সিমেন্টের গোল গোল বসার জায়গা। হঠাৎই রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল সাগরদিঘির চারপাশ।

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch (Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC	Rs. 650	900
Deluxe AC	Rs. 990	1200
Super Deluxe AC	Rs. 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs. 2000	2000
Suite	Rs. 3000	3000
VIP Suite	Rs. 3500	3500
Extra Occupancy (N-AC)	Rs. 100	--
Extra Occupancy (SC)	Rs. 200	--

N.B. *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

শীতকালে সাগরদিঘির বুকে ছেয়ে থাকত পরিযায়ী পাখি। এর ফলে ধীরে ধীরে আসা বন্ধ হল তাদেরও। দিঘির চারপাশের ড্রেন বুজিয়ে তার উপর দিয়ে বানানো হল ফুটপাথ। তারপর থেকেই সাগর দিঘির চারদিকে একটু বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়াতে শুরু করে।

মোটামুটি বছর দশেক অন্তর অন্তর সংস্কারের নামে সাগর দিঘিকে নিয়ে এধরনের একের পর এক এক্সপেরিমেন্ট চলে আসছে। তারই নবতম সংযোজন ছিল সাগরদিঘিতে ভাসমান রেস্টুরেন্ট। সাথে বোটিং এবং তার জন্য তৈরি টিকিট ঘর। বিভিন্ন সংগঠনের চাপে পড়ে প্রশাসনকে পিছু হঠতে হয়েছে। রেস্টুরেন্ট বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে তারা। তা সত্ত্বেও ঐতিহ্যশালী সাগর দিঘির পূর্ব দিকের ওই বাঁশের মাচা ও টিকিট ঘর চোখকে পীড়া দিত। দীর্ঘদিন থাকার পর সম্প্রতি সেটি সরানো হয়েছে। আপাতত সাগর দিঘিতে বন্ধ হয়েছে বাচ্চাদের সাঁতার শেখানো। কিন্তু যা কোনওমতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না তা হল সাগর দিঘিতে স্নান ও জামা কাপড় কাচা। যদিও তা নিষিদ্ধ বলে বড় করে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া রয়েছে পৌরসভার পক্ষ থেকে, তবু জল, পরিবেশ ও দৃশ্য দূষণ হয় যখন সাগর দিঘির রেলিংয়ে বিছানার চাদর, জামা কাপড় শুকোতে দেখা যায়। বিশেষ করে শিবমন্দিরের ঘাটে যারা স্নান করছে তাদের বাধা দেওয়ায় নাকি প্রশাসনকে শুনতে হয়েছে, এখানে স্নান করে আমার বাবা, দাদু সকলে পুজো করত, আমরাও করব। যান আপনাদের কী করার আছে করে নিন। জেলাশাসকের কথায়, বেশি জোর করলে সেটা সেন্টিমেন্ট চলে আসবে। কাজেই প্রথমেই পুলিশ প্রশাসন দিয়ে হবে না, বরং মানুষকে সজাগ হতে হবে। বিশেষ করে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে, তারা বুঝিয়েসুঝিয়ে যদি কিছু করতে পারে। কিন্তু সাগর দিঘির উত্তর পাড়ে ফুটপাত দখল করে দিব্বি দোকান চালাচ্ছে যারা সেখানেও কি প্রশাসনের কিচ্ছু করার নেই ?

এ তো গেল উত্তর পারের কথা। দিঘির পশ্চিম পারে রাতে কবে শেষ আলো দেখা গিয়েছিল তা আকাশ পাতাল ভেবেও মনে করতে পারবে না একজন শহরবাসী। আলো যদিও বা দেওয়াও হয়, তা হলেও কোনও অজানা কারণে সেই আলো দু এক দিনের বেশি টেঁকসই হয় না। আর আলো না থাকলেই সন্ধ্যের পর সেদিক দিয়ে যাওয়া আসা করা বেশ অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায় বলে অভিযোগ। সেখানে অল্পবয়সীদের ভিড়, নেশাভাঙও চলে দেদার। তবে আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর ধন্যবাদ প্রাপ্য, তাঁর 'উৎসব' উদ্বোধন উপলক্ষেই পশ্চিম পাড়ে নতুন করে আলোর দেখা পাওয়া, যা এখনও অক্ষত।

জেলা মৎসদপ্তরের অধীনে থাকা এই দিঘির চারিদিক বছরভর আগাছাভূমি, চার কোণ ঢেকে থাকে রকমারি হোর্ডিংয়ে। সাগরদিঘির পাড় সাইলেন্স জোন, মাইক বাজানো বন্ধ, কিন্তু দিনরাত্রি গাড়ির তীব্র হর্নের দাপট বন্ধ করবার রীতি বা নীতি নেই। দিঘির জলে ভেসে থাকে থার্মোকল, প্লাস্টিকের গ্লাস, ঠোঙ্গা, পাউচ, মদের বোতল, আরও কত কী। বাস্তুতন্ত্রের বারোটা বাজছে বলে দুঃখ করেন শহরবাসী প্রাতভ্রমণকারীরা। কিছু রাজহাঁস ছাড়া হয়েছিল দিঘির জলে, খাদ্যের অভাবে তারা পাড়ে, কখনও রাস্তা পেরিয়ে আশপাশের দোকানগুলোতে ঘুরে বেড়ায় খাবারের আশায়।

বছরখানেক আগে শোনা গিয়েছিল, আবার নাকি পূর্বাবস্থায় ফিরতে চলেছে সাগরদিঘি। চারিদিকের লোহার রেলিং ভেঙ্গে ফেলে সাগর দিঘিকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা হবে। নতুন করে নাকি আবার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে ঐতিহ্যশালী এই দিঘিকে নিয়ে। সে সময় জেলাশাসক জানিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে খড়্গপুর আইআইটি-র একটি বিশেষজ্ঞ দল সাগরদিঘি নিয়ে একটি প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করছেন। তারা এখানে এসে স্থানীয় বয়স্ক মানুষ, বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন, ইতিহাসবিদ - এদের সাথে কথা বলবেন। সব দেখে শুনে তারা একটি প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করবেন। সেই বিশেষজ্ঞ দল বেশ কয়েকবার এসে ঘুরে গেছেন, তবে আজ পর্যন্ত কোনও রিপোর্ট নেই। আরও জানা গিয়েছে, গ্রীন মিশনের ফান্ডের টাকায় আটটি দিঘির মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ছয়টি দিঘি সংস্কার করবে পুরসভা। আর দুটো দিঘি সংস্কার করবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। শম্বুক গতিতে হলেও কোথাও কোথাও সেই কাজ শুরু হয়েছে চোখে পড়ছে।

সৌন্দর্যায়নের নামে সাগর দিঘিকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট বহু বছর ধরেই শুরু হয়েছে। শীতকালে সাগরদিঘির বুকে ছেয়ে থাকত পরিযায়ী পাখি। এর ফলে ধীরে ধীরে আসা বন্ধ হল তাদেরও। জেলা মৎসদপ্তরের অধীনে থাকা এই দিঘির চারিদিক বছরভর আগাছাভূমি, চার কোণ ঢেকে থাকে রকমারি হোর্ডিংয়ে। সাগরদিঘির পাড় সাইলেন্স জোন, মাইক বাজানো বন্ধ, কিন্তু দিনরাত্রি গাড়ির তীব্র হর্নের দাপট বন্ধ করবার রীতি বা নীতি নেই। দিঘির জলে ভেসে থাকে থার্মোকল, প্লাস্টিকের গ্লাস, ঠোঙ্গা, পাউচ, মদের বোতল, আরও কত কী। বাস্তুতন্ত্রের বারোটা বাজছে বলে দুঃখ করেন শহরবাসী প্রাতভ্রমণকারীরা।

একটা সময় সরকারি ও পারিবারিক মিলিয়ে কোচবিহার সদরেই ছিল প্রায় ৭০টার মত দিঘি। আজ তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দিঘিই ভরাট হয়ে গেছে। দিঘি বুজিয়ে গড়ে উঠেছে বহুতল বাড়ি, কেবল সেই দিঘিগুলির নাম লোকমুখে বেঁচে আছে। এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট বা ইনল্যান্ড ফিসারিজ অ্যাক্ট-কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এই শহরের বুকে ভরাট হয়ে যায় মরাপোড়া দিঘি বা সন্ন্যাসী দিঘির মত বিশালাকায় প্রাচীন দিঘিগুলো (যদিও প্লট ম্যাপে আজও তার অস্তিত্ব রয়ে গিয়েছে, কৌতূহলীরা ইন্টারনেট খুলে যাচাই করে নিতে পারেন)। আজও একটু একটু করে আয়তন ছোট হয়ে যাচ্ছে কিছু দিঘির।

বর্তমানে কোচবিহার সদরে ৩৪টি সরকারি দিঘি রয়েছে। পারিবারিক দিঘির সংখ্যা ১২টি। ভরাট হয়ে গিয়েছে ১৫টিরও বেশী দিঘি। সরকারি দিঘিগুলির সিংহভাগ রয়েছে জেলা মৎস দপ্তরের অধীনে। দুঃখের বিষয়, দিঘিগুলির সৌন্দর্যায়ন তো দূরের কথা, সামান্য জঙ্গল কাটারও প্রয়োজন অনুভব করেন না তাঁরা। তাঁদের সাফ জবাব, মৎস্য উৎপাদন করতেই তাঁরা নাকি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, সৌন্দর্যায়ন বা জবর দখল মুক্ত করবার জন্য প্রয়োজনীয় সময়, বাজেট, লোকবল বা উপরতলার নির্দেশ ইত্যাদি সব কোথায় ? শহরের বেশিরভাগ দিঘিরই মুখ আজ ঢেকে গেছে জঞ্জালে। দূষণে ভরে যাচ্ছে দিঘির তলদেশ। আর কী করছেন কোচবিহার পুরসভা? সাধারণ নাগরিকদের স্পষ্ট জবাব, বহুদিন হল মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে ভুলে গেছেন কোচবিহারের পুর প্রতিনিধিরা। সে দায়বোধ হারিয়ে ফেললে কোনও কিছুই সম্ভব নয়, অন্তত যতদিন না মানুষ তাঁদের ওই দূষিত দিঘির জলে নিক্ষেপ করবার সুযোগ না পায়।

অনেকেই বলেন, এত বছর ধরে দিঘিগুলি তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, জমি সংকটের এই যুগে শহরের বুকে সেটাই বা কম কী? ঠিক কথা। কিন্তু দূষণের থাবায়, জমি দখলের খেলায়, স্থানীয় নেতা-মন্ত্রী ও সাধারণ মানুষের চরম উদাসীনতায় ধীরে ধীরে ঐতিহ্যমণ্ডিত দিঘিগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে চলে যেতে পারে সে কথা অস্বীকার করছেন না তাঁরা কেউই। সরকারের হেরিটেজ ঘোষণা ও উদ্যোগকে স্বাগত জানায় রাজনগর কোচবিহারের আমজনতা। অনেকেরই দাবি, মুর্শিদাবাদের লালবাগ যদি সেজে উঠতে পারে, কলকাতার পতিত জলাজমি যদি নান্দনিক ইকো পার্কে বদলে যেতে পারে, তবে কোচবিহারের একশ বছরেরও পুরনো ঐতিহ্যশালী দিঘিগুলি কেন বাদ থাকবে?

কিন্তু এটাও তো বাস্তব যে একটা শহরের পরিবেশকে বিপন্ন করে তার হেরিটেজ পুনরুদ্ধার কখনই সম্ভব নয়। দিঘির শহরে সেই পরিবেশ যদি দিঘির হাত ধরেই নষ্ট হয় তার থেকে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? পরিবেশবিদরা বলেন, এই দিঘিগুলি হল শহরের ফুসফুস। জনবিস্ফোরণের শহরে সেই ফুসফুসকে সচল সজীব রাখাটা অত্যন্ত প্রয়োজন। কোচবিহার গবেষক স্বপন কুমার রায়ের কথায়, কোচবিহারের নির্মল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য রাজারা সেই আমলে এতগুলো দিঘি খনন করিয়েছিলেন। এরা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে যেমন সাহায্য করে, তেমনি আমাদের অক্সিজেন যোগায়। দিঘিগুলি আমাদের রক্ষা করতেই হবে।

হেরিটেজ রক্ষা করা মানে তাই শুধু বড় বড় মূর্তি বসানো, রাস্তায় বাতি লাগানো বা সংগ্রহশালা তৈরি করা নয়, তার আগে দিঘিগুলিকে অবিলম্বে দূষণ মুক্ত করতে হবে। পর্যটনে যেখানে এত জোর দেবার কথা হচ্ছে, সেখানে বাইরের পর্যটকরা এসে কী দেখবেন? একের পর এক অপরিচ্ছন্ন পরিত্যক্ত পুতি গন্ধময় নরকতুল্য সব দিঘি? নাকি আমরা দোকানঘরের মনোহর সব শোরুম আর বহুতল পার্কিং প্লাজা দিয়ে ঢেকে রাখব আমাদের নগ্ন হেরিটেজকে? দিঘির জল থেকে যে দূষণ ছড়াচ্ছে তার সৌজন্যে কী কী কঠিন রোগ শহরের বায়ুতে ছড়াচ্ছে তা জানতে কোনও বৈজ্ঞানিক দলকে আনবার সৎ সাহস কি কারুর আছে? আমাদের সন্তানেরা যারা দ্রুত বড় হয়ে উঠছে, বাইরে যাচ্ছে পড়াশুনার জন্য কিংবা এই শহরেই থাকছে সংস্থানের আশায়, তারা শীঘ্রই সঠিক জবাব চাইবে নগরপতিদের কাছে — যে কটি জলাশয় বেঁচে আছে সেগুলিতে কীসের সন্ধান করব আমরা? খুইয়ে বসা হেরিটেজ? নাকি শ্বাস নেওয়ার মত শুদ্ধ অক্সিজেন?

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

জলঢাকার কোলে দুটি রাত

শ্রাবণের মেঘমেদুর ভোর। নিশীথ এল যথাসময়ে অটো নিয়ে। ৭-১০-এর বামনহাট প্যাসেঞ্জার। গন্তব্য নাগরাকাটার কাছে জলঢাকার নদীর কোলে শুভম ভ্যালি রিসর্টে কয়েকটি দিন কাটানো মানে চা-বাগান, জঙ্গল, নদী, ঝোরা, খোলাতে ঘুরে বেড়ানো। নয়া সাঁইলি চা-বাগানের বড়বাবু স্নেহভাজন সুকান্তর সঙ্গে আগাম বার্তালাপ হয়েছিল—"নাগরাকাটা স্টেশনে গোলাপচাঁদ গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে। শুভম ভ্যালিতে বিশ্রাম করে সটান আমাদের কোয়ার্টারে চলে আসুন। জমিয়ে আড্ডা, গল্পগুজব হবে।" হায় রে! মানুষ ভাবে এক হয় আরেক। একমনে রেল গাড়িতে চেপে সবুজ চা-বাগান, জঙ্গল, মেঘে ঢাকা পাহাড়ে নিমগ্ন হঠাৎ দড়াম করে ট্রেনের জানালা এসে পড়ল ডান হাতের আঙুলে। তারপর রক্তাক্ত অবস্থায় গামছা পেঁচিয়ে মালবাজার হাসপাতালে। ইনজেকশন, সেলাই, অ্যান্টিবায়োটিক, ব্যথার ওষুধ কিনে হাসপাতালের কাছে দেখি গোলাপচাঁদ গাড়ি নিয়ে চলে এসেছে। —"বাবুজী আপকা ফোন জব মিলা তুরন্ত বড়াবাবু নে মুঝে ভেজ দিয়া"। প্রায় আড়াই ঘণ্টা হাসপাতালে। ছোকরা ডাক্তারবাবুকে বললাম— ধন্যবাদ। দু-চারদিন ঘোরাঘুরি করতে পারব তো? গিন্নি খেপচুরিয়াস—'জঙ্গল, চা-বাগান, নদী লক্ষ বার দেখেছ। সুখে থাকতে ভূতে কিলায়'। ডাক্তারবাবু বললেন, "থাকুন। কিন্তু ড্রেসিং খুব প্রয়োজন। দু'দিনের বেশি নয়।"

চলো যাই। তারপর পথে চালসার গোলাইতে একটু সময় চা ও টায়ের জন্য নামা। একটু লাল চা আর নেতানো পুরী খেয়ে পথ চলা। চাপরামারি জঙ্গল, খুনিয়া মোড়, যাদু পাহাড়ের ল্যান্ডস্কেপ দেখতে দেখতে জলঢাকা নদীর পাশ দিয়ে সুখানী বস্তির হোলসেল মোড়ে ঢুকে একটু খানি গেলেই শুভম ভ্যালির সিংহ দরজা খুলে গেল। তরুণ সদাশয় ম্যানেজার বলল —আপনাদের জন্য একেবারে নদীর কাছে নজরমিনারের নিচে নিরিবিলি ঘর রাখা আছে। বললাম— একটু চা খেয়ে চলে যাব নয়া সাঁইলি। সন্ধ্যায় ফিরে আসব। সেন মহাশয়কে বলে রেখ তখন আড্ডা দেওয়া যাবে। গোটা রিসর্ট এখন হাউসফুল। সেন দম্পতি তদারকি করতে ব্যস্ত। যাবার পথে বলে গেলাম— সন্ধ্যার আগে ফিরে আসব। সুখানি থেকে চম্পাগুড়ি, সেখান থেকে থালঝোরা, জিতি হয়ে ভুটানের নানা প্রান্তে। যে দিকে চোখ মেলি ছবির চেয়ে সুন্দর চা-বাগান। চম্পাগুড়ি এলে মনে পড়ে স্নেহভাজন কবি সমীরণ ঘোষ, জয়দেব মাস্টার, হিলার রামঅবতার, ভগতপুরের মিস্ত্রি মশাই, ল্যাম্পসের পরান ভাই, সুমনা, মহুয়া, ছড়ছড়িয়া মশাই। অনেকের নামও ভুলে গেছি। আজ মনেই করতে পারব না জিতি চা-বাগানের বাবুমশাইদের। আমি অচেনা পথিক। ভ্যাগাবন্ড বাউন্ডুলে ঝোলা মাত্র সম্বল ডায়েরি, শস্তার ক্যামেরা, এক মুঠো বিড়ি না হলে চারমিনার। চরৈবেতির রসধারায় সিক্ত থাকা। কী আর চাহিব নাথ তব কাছে? পৌঁছে গেলাম নয়া সাঁইলি চা-বাগানের বড়বাবুর কোঠিতে। বড় জরাজীর্ণ, সংস্কার নেই বহু বছর। ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ। সম্মুখে অন্তহীন সবুজের সমারোহ। ডানদিকে চা-বাগানের স্থায়ী পুজো মন্ডপ। কুলিকামিন, বাবু, ম্যানেজার কর্মব্যস্ততা। যুঁই বারান্দায় দাঁড়ান।

—কাকুর আঙুল কেমন আছে?

—ওটা নিয়ে ভাবছি না। ভাল হয়ে যাবে।

গিন্নি রাগে গজগজ করছে—তোমার ঘোরা রোগ

বন্ধ করতেই হবে। বড়বাবু হাসে।

ডানহাত ব্যথায় টনটন করছে। যুঁই বলে— 'কাকু তোমার কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। একটু শুয়ে থাকো চা-টা খেয়ে।

—সেই ভাল। বাইরে গিন্নি পাঁচালি পাঠ করে চলেছে। আমি খোলা জানালা দিয়ে দেখছি গাছের পাতায় রোদের ঝিলিক। পাখিদের কোরাস গান। ফুরফুরে হাওয়ায় চোখ জুড়িয়ে আসে। চুপটি করে শুয়ে থাকা ছাড়া কীই বা কাজ। দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠা দরকার। দুপুরে খাওয়ার টেবিলে যখন ডাক এল তখন ঘুমিয়ে পড়েছি। সুকান্ত ডাকে, —'দাদা চলে আসুন।' ভেবে পাই না যুঁই কত কিছু রেঁধেছে। বোরোলি থেকে বড় মাছ, মাংস, ডাল, ভাজা, তরকারি, চাটনি, শেষ পাতে মিষ্টি। ডান হাত অকেজো। বাধ্য হয়ে বাঁ হাতের অভ্যেস শুরু করি। চামচা দিয়ে কি মাছ-ভাত খাওয়া যায়? কস্মিনকালে এ অভিজ্ঞতা হয় নাই। অসুবিধা হলেও মানিয়ে নিতেই হবে। খাওয়া দাওয়ার পর একটু বারান্দায় বসি। সামনের পথ দিয়ে মোটর সাইকেলে বাবুরা না হলে হেঁটে শ্রমিকরা যাতায়াত করছে। যুঁই বলে, "দু-চার দিনের জন্য ভাল লাগে। শিলিগুড়িতে যানজট, দূষণ, কোলাহল কলরব থেকে এখানে এলে মনে হবে স্বর্গ। কিন্তু আমার হয়েছে উল্টো। দিনভর একা। রান্নাবান্না ঘরকন্না বই পড়ে আর কতক্ষণ। ভীষণ মন উথালপাথাল হয়ে ওঠে। কথা বলার লোক নেই। কোথায় যাব ভেবে পাই না। ও তো কাজের মধ্যে ডুবে থাকে কোনও অসুবিধা নাই।"

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে যাবারর জন্য প্রস্তুত হই। যুঁই বলে, 'কাকা চা খেয়ে যাবেন'। গোলাপচাঁদ খুব পাংচুয়াল। ঠিক চলে এসেছে।

আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। গোটা রিসর্ট আলোয় আলোকিত। দু'জনে পৌঁছে যাই কটেজে। বারান্দায় নানারকম বিচিত্র পোকার উৎপাত অত্যাচার। সেন মহাশয় এসে বললেন, 'আপনার আঙুল কেমন আছে?' ব্যান্ডেজ করা। রিসর্ট তৈরির ইতিহাস শোনালেন। রিসর্টে প্রচুর ফুলগাছ লাগিয়েছেন। কাজেকর্মে যখন একঘেয়েমি লাগে তখন এখানে চলে আসি।

খেয়েদেয়ে আলো নিভিয়ে চুপচাপ বাইরে বসে থাকি। দূরে মাদলের শব্দ, জলের কলতান, বাদুরের

ডানা ঝাপটানো, রাতচরা পাখিদের ডাকাডাকি। টুরিস্টদের চেঁচামেচি ভালই লাগছে। লোকেশন হিসেবে আমাদের আস্তানাটি মন্দ নয়। মাথার উপরের নজরমিনার। ক্ষত আঙুল নিয়ে সতর্ক। গিন্নি বলে, 'এভাবে কতক্ষণ বসে থাকবে? শোবে না?'

ভোরবেলায় গজেবোতে বসে পাখিদের প্রভাতী সঙ্গীত শুনছি, ঠিক সেই সময় একটি মেয়ে চা-বিস্কুট নিয়ে এল।

—আন্টি ওঠে নাই

—না গো তেনার চায়ের নেশা নাই। রেখে যাও আমি খেয়ে নেব।

খুব ভাল লাগছে। সুন্দর সকাল। চক্ষু মুদে ধ্যান করুন। নির্মল বাতাস উপভোগ করুন। দুই-একজন টুরিস্ট এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে লাল ঝামেলা, নানা চা-বাগান বেড়ান যুঁইদের সঙ্গে। গিন্নি উঠল দেরীতে। বলে 'সত্যি কী শান্তি'। কাজের মাসির আশা নিয়ে টেনশন নাই। রান্না ঘরে ঢুকে হাঁড়ি ঠেলার চাপ নেই। অঢেল বিশ্রাম। বেড়াতে এলে এটাই নিট লাভ। সেন দম্পতির আহ্বান— 'মাস্টারমশাই ব্রেকফাস্ট খেতে চলে আসুন। তারপর কী প্রোগ্রাম আপনাদের?'

এখান থেকে নয়া সাঁইলিতে যাব গতকালের মত, তারপর বিকেলের দিকে লাল ঝামেলায়।

—আমরা গেছি। জায়গাটার সেরকম উন্নয়ন হল না। পিকনিকের সময় ধুমধুমার কান্ড। সন্ধ্যার আগে চলে আসবেন কিন্তু। আড্ডা হবে।

—ঠিক আছে।

সকালে প্রাতঃরাশের আয়োজন বিপুল। বয়স হয়েছে এত কি খাওয়া যায়? যাই হোক দশটায় বের হয়ে নয়া সাঁইলি। বড় সুন্দর মোহময় কাব্যিক পথ। ক্ষমা করবেন এ পথের বর্ণনা দিতে আমি পারব না। এক কথায় আনপ্যারালাল। এক্সিলেন্ট। চোখ জুড়িয়ে যায়। গাড়ি থেকে নামতেই যুঁই বলে— কাকু ব্রেকফাস্ট খাবেন না?

—ওটা সেরে এসেছি।

আজ রবিবার। চা-বাগান বন্ধ থাকলেও বড়বাবুর চাপ সর্বক্ষণ। ম্যানেজারবাবুর ফোন, নানান সমস্যা। ঠিক হল দুপুরে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা বেড়াতে যাব লাল ঝামেলায়।

আমাদের আড্ডা বা আলোচনার বিষয় চা-বাগানের জীবনযাপন। এখানে প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী কিছুই পাওয়া যায় না। ছুটতে হয় নাগরাকাটায়। সপ্তাহের হাট চম্পাগুড়ি। রবিবার বসে। অতিথি অভ্যাগত এলে বড় অসুবিধা হয়। তারপর মেলামেশা কোথায় যাব মনের মানুষের সন্ধানে। গতকালের মত দুপুরের খাওয়া সেরে বিছানায় লম্বা হই। সুকান্ত পাশে বসে বলে— এ প্রজন্মের ছেলেপুলেরা চা-বাগানে কাজ করতে উৎসাহী নয়। নেহাৎ ঠেকে না গেলে কেউ আসতে নারাজ এখানে। গিন্নী যুঁইয়ের সঙ্গে শাড়ি গহনা শ্বশুর বাড়ি বাপের বাড়ির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে। বিকেলবেলায় আমরা বেরিয়ে পড়ি লালঝামেলার উদ্দেশে। গ্রাসমোর, লুকসান, কেরন, চ্যাংমারি চা-বাগান ও জনবসতির মধ্যে দিয়ে পৌঁছে গেলাম লাল ঝামেলায়। লোকমুখে শোনা লাল ওরাওঁ, ঝামেলা ওরাওঁর নামে নাকি নামকরণ হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন— লাল পার্টিদের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল। সেই থেকে এখানকার নাম হয়েছে লাল ঝামেলা। সত্যি মিথ্যে যাই হোক জায়গাটা নিঃসন্দেহে সুন্দর। সম্মুখে ভুটান পাহাড়। মাঝখানে বয়ে চলেছে ডায়না নদী। এই সময়ে নদী পার হয়ে ওপারে যাওয়াও মুশকিল। আমরা একটু আশপাশে ঘোরাঘুরি করি। লাল ঝামেলার সৌন্দর্য দেখি। ঘণ্টাখানেক চারপাশটা ঘুরে আমরা গ্রাসমোরে আমরা চা-দোকানে বসে চা খেয়ে সোজা চলে যাই কুর্তি চা-বাগানের মন্দিরে সন্ধ্যারতি দর্শনের জন্য। এমন সুন্দর পবিত্র ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ চা-বাগানের মাঝখানে সত্যি মনকে ছুঁয়ে যায়। আমরা আধঘণ্টা মন্দির প্রাঙ্গনে বসে থাকি তারপর ফিরে আসি শুভম ভ্যালিতে।

ঘরে ঢোকার পথেই সেন দম্পতির সঙ্গে দেখা। বললেন, আপনারা ফ্রেশ হয়ে আসুন। কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে গল্প করে নিজের ঘরে ফিরে যাই। রাত্রি দশটার সময় ঘরে খাবার পাঠায়। সেই সময় হঠাৎ দেখি সুমনা, তার মেয়ে এবং জামাই উপস্থিত। ফেসবুকে জানতে পেরে এখানে হাজির। অভিযোগ করে বলল— আপনি আমাদের পাড়ায় এসেছেন অথচ আমাকে জানালেন না। আগামীকাল যদি আপনারা থাকেন তবে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব।

বললাম, এ যাত্রায় আর হল না। পরের বার যদি আসি তবে অবশ্যই যাব। কাল সকালে ফিরে যাব নিজের জায়গায়।

প্রাতঃরাশের সময় সেন দম্পতি জিজ্ঞেস করলেন— আপনারা কি আজকেই চলে যাবেন?

বললাম— হ্যাঁ।

—তবে ট্রেনে না গিয়ে আমাদের সঙ্গেই চলুন। আমরাও শিলিগুড়ি ফিরব। আপনাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের বাড়ি যাব।

নাগরাকাটা

যাতায়াত ঃ শিলিগুড়ি থেকে ৬৭ কিলোমিটার।
রেলস্টেশন নাগরাকাটা রিসর্টে থাকার জন্য
যোগাযোগ ঃ ৯৯৩২১ ৪৩৪৩২।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
ছবি শিবুন ভৌমিক

ডুয়ার্স থেকে দার্জিলিং

দ্বিতীয় পর্ব

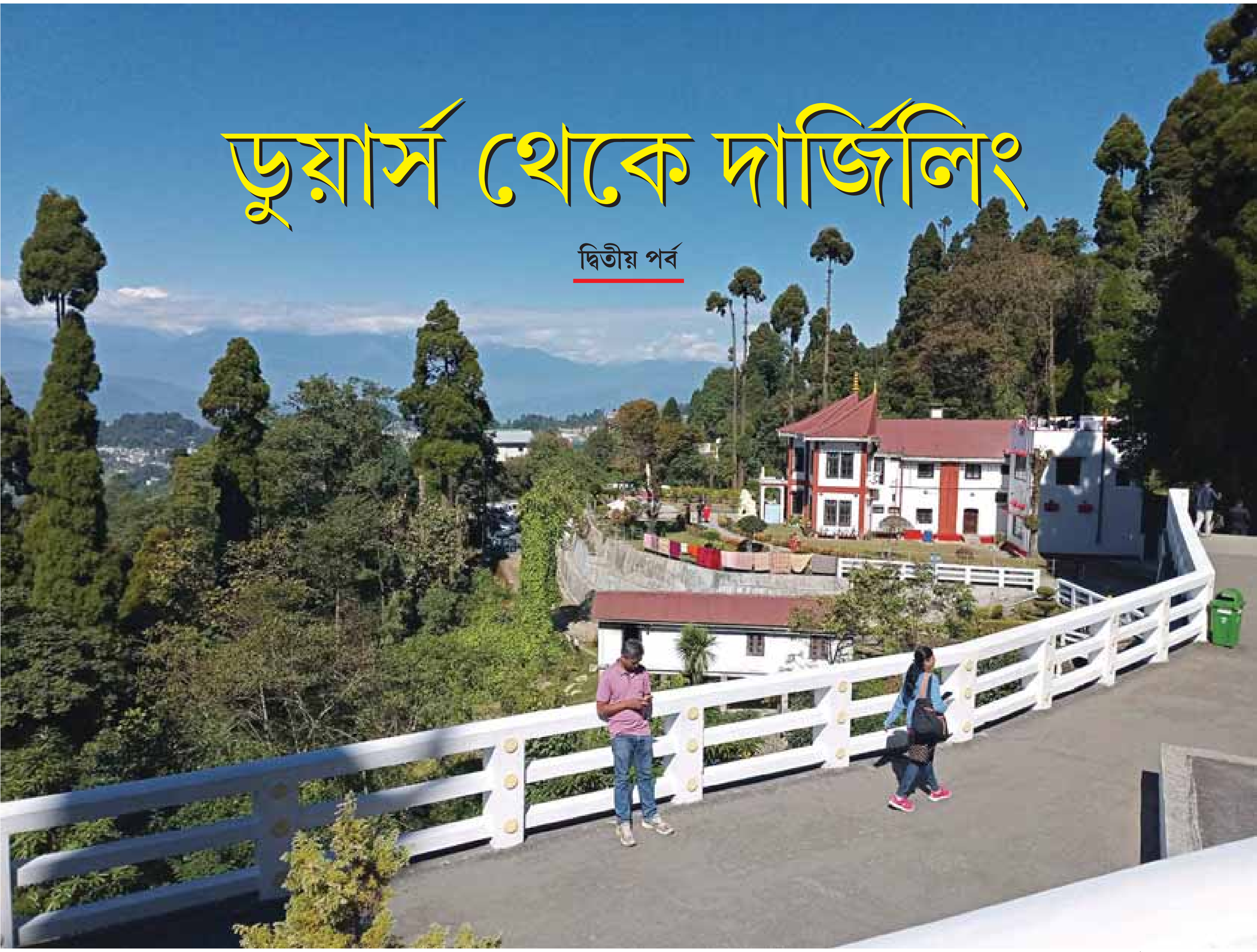

সরকার ভিলা, দার্জিলিং

সকালে হোটেলের ঘরের ব্যালকনিতে পা রাখতে গিয়ে দেখি বাঁদর একটা। খাদ্যের সন্ধানে এসেছে। মাঝে মাঝে বাহিনী ধরে আসে। হোটেলের লোক মিহি আওয়াজের পটকা ফাটিয়ে ভাগিয়ে দেয়।

বাইরে এসে বুঝলাম আবহাওয়া দিব্যি পরিষ্কার। আজ চিড়িয়াখানায় ঢুকে সেখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে মাউন্টিং ইনস্টিটিউটের যাদুঘর দেখব বলে ঠিক করা ছিল। তারপর অন্য কোথাও। গাড়ির চালকের নাম বসন্। সাইট সিইং করাতে গিয়ে স্থানীয় ড্রাইভার কাম গাইডেরা 'পয়েন্ট' শব্দটা খুব ব্যবহার করে। বসন্ মোটামুটি আজকে তিন পয়েন্ট, কালকে দু পয়েন্ট মিলিয়ে বোধহয় বারোটা পয়েন্ট দেখাবে বলেছে। একটা পয়েন্ট পরে বাদ দিয়েছিল। সেটা হলো রোপওয়ে। দুর্ঘটনার পর সেটা বন্ধ।

কিন্তু দশটা বাজতে আড়াই ঘন্টা বাকি। ভাবলাম, ম্যাল থেকে পাক মেরে আসি। যাওয়ার পথের বাজারটা তখন সবে বসবে বলে উদ্যোগ নিচ্ছে। ম্যাল মোটামুটি ফাঁকা। একঝাঁক স্কুলের বাচ্চা এক কোনায় প্রার্থনা

রক গার্ডেন

করছিল। স্কুলটা বোধহয় কাছেপিঠে কোথাও। তবে বেঞ্চিগুলো প্রায় ভর্তি। তার পেছনে চায়ের জলও ফুটছে।

ম্যালের সব চাইতে ভালো জায়গায় ক্যাফে কফি ডে। পেছনে খাদ ঘেঁসে খোলা জায়গায় স্মোকিং জোন। তারপর বিশাল পর্বত রোদ্দুরে ঝক ঝক করছে। এই পরিবেশে চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলে কফির কাপ রেখে সুখটান দেওয়ার আশায় সেখানে ঢুকে মোক্ষম একটা কফি বানাতে বলে বসলাম। পৌনে দশটা নাগাদ ঘোর কাটল। দেখলাম অদূরে দুই বিদেশিনী সুন্দরী দুর্বোধ্য ভাষায় দুটি বাঙালি কিশোরীর মতই কলকল করছে এবং মোবাইলে চোখে রেখেই।

এগারোটার একটু আগে গাড়ি চালান শুরু করে বসন্ বলল, 'পোইলে জু।'

আমি হোটেল থেকে বের হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে নেট খুলে জু পড়তে গিয়ে একটা তথ্য পেয়েছি। তাই বসন্‌কে বললাম, 'আজ তো থার্স ডে।'

'নহী। আজ তো ওয়েন্স ডে আছে।'

তারপর গাড়ির স্পিড একদম কমিয়ে দিয়ে কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'গলতি হো গয়া। আজ তো জু ক্লোসড হ্যায়।'

গাড়ির সওয়ারিদের কেউই এত আদৌ বিচলিত হল না। বসন্ বলল, দু-আড়াইটে পয়েন্ট দেখিয়ে যাবে রক গার্ডেন। তারপর হরেক সরু মোটা গলি বেয়ে, কয়েকবার ওঠা নামা করে জানাল, রাস্তাটা এখন রোপওয়ের দিকে যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল, তেনজিং রক পথেই পড়বে। সেখানে টেলিস্কোপে পাহাড় দেখার ব্যবস্থা আছে।

তেনজিং রক-এর পাশে পর পর দোকান। চা পাতা বিক্রি হচ্ছে। মন্দ নয়। দামও সমতলের তুলনায় শস্তা। কিন্তু টেলিস্কোপওয়ালারা বসেছে আরও একটু এগিয়ে। সেখান থেকে নিচে চা বাগান দেখা যায়। বসন্-এর হিসেবে সেটাও একটা পয়েন্ট। কিন্তু আমি পস্ট বলে দিলাম, চা বাগান কোনও পয়েন্ট নয়। টেলিস্কোপও কোনও পয়েন্ট হতে পারে না। কারণ, সে যে ছাপান কাগজটা দিয়েছে সেখানে পয়েন্টের তালিকায় টেলিস্কোপ নেই।

বসন্ একটু অবাক হয়ে বলল, 'টি গার্ডেন নহী দেখেঙ্গে? আপ আয়া কাঁহাসে?'

বললাম। বসন্ তাই শুনে হাত-মাথা ঝাঁকিয়ে যা বলল তা হল, সত্যিই তো! জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি থেকে এসে চা বাগান, ফ্যাক্টরি এসব দেখবে কেন! কিন্তু পয়েন্ট যে তবে কমে যাবে!

ঠিক হল, চা বাগানের বদলে সে দার্জিলিং আর ঘুম স্টেশনে নিয়ে যাবে। দার্জিলিং টু ঘুম টয় ট্রেনের জয় রাইড চলে। পেল্লায় ভাড়া। সেটার কথা বলতেই সে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, খবরদার যাবেন না! পুরো লস আইটেম।

কথাটা সে মন্দ বলে নি পরে বুঝেছিলাম। ভাগ্যিস চড়ি নি।

বউ-এর গাছ বাইবার অভ্যেস আছে। সে কোমরে দড়ি বেঁধে তেনজিং রক-এর চুড়োয় উঠল। সে সব সারা হলে মিনিট দশেক গাড়ি চাপার পর যেখানে দাঁড়ালাম, সেটা পর পর চার-পাঁচটা দোকানের সারি। দুটো দোকানের মাঝখান দিয়ে একটু নেমে গেলেই টেলিস্কোপ নিয়ে দুটো ছেলে পর্যটকদের সিকিম দেখাচ্ছে। বুদ্ধের মূর্তি, কী জানি একটা মন্দির, কাঞ্চনজঙ্ঘা। মাথা পিছু কুড়ি টাকা। দেখার লোক অবশ্যি খুব কম। আমি দেড়শো টাকা দিয়ে একটা টেলিস্কোপ আধা ঘন্টার জন্য নিয়ে নিলাম। তারপর তাক করলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারাবৃত মস্তকে।

সে বড় নয়নাভিরাম। এক হিমশীতল মৃত্যুর দেশ। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সিকিম দেখলাম একটু একটু। সঙ্গে আরও কিছু। শেষে উৎসাহি টেলিস্কোপ মালিক আমার মোবাইল ফোনের ক্যামেরা টেলিস্কোপের পেছনে ধরে ছবি তুলে দিল কিছু। ফ্রি তে। তারপর ছবি ধরে বুঝিয়ে দিল কী ভাবে পাশাপাশি চূড়া আর খাঁজগুলো মিলে বুদ্ধের মুখ তৈরি হয়েছে।

মানুষের কল্পনাশক্তি সত্যিই অমিত।

রক গার্ডেনের দিকে যাওয়ার আগে গেলাম সেই বাড়িতে যা জগদীশচন্দ্র বোস কিনেছিলেন এবং সিস্টার নিবেদিতার শেষ দিনগুলো যে বাড়িতে কেটেছিল। অসাধারণ এক পরিবেশ দন্ডায়মান দোতলা বাড়ি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবলাম জগদীশবাবু রসিক ছিলেন বটে। সেকালে নিশ্চয়ই আরও মনোরম, আরও শান্ত ছিল জায়গাটা! ভাগ্য বিড়ম্বিত নিবেদিতাও নিশ্চয়ই

বসন্ যে গোর্খাল্যান্ড চায় সেটা আমি তেনজিং শিলার পাশে এক দোকানে সিগারেট টানতে টানতে জেনেছি। নাকে মুখে ধোঁয়া ছেড়ে সে বুঝিয়েছে সেটা। মমতা জি তাঁর কাছে মিত্রপক্ষ না হলেও সিচুয়েশন ভাল থাকায় সে ধন্যবাদ দিয়েছে। এটা সে অবশ্যই মানে যে গোর্খাল্যান্ড করতে গিয়ে টুরিস্ট হারালে চলবে না। অফ সিজিনে মুভমেন্ট আর সিজিনে টুরিস্ট— এটাই তাঁর কাম্য। আপাতত বিনয়বাবুর কাজে সে বেশ সন্তুষ্ট।

জীবনের শেষ ক'টা দিন এই পরিবেশে শান্তির সন্ধান পেয়েছিলেন।

বেলা গড়াচ্ছে। পথে আরও একটা পয়েন্ট দেখে যেতে হবে রক গার্ডেন। আজকের সেরা পয়েন্ট। বসন্‌কে বোঝালাম, দার্জিলিং দেখতে এসছি। দু-চারটে পয়েন্ট বাদ গেলে যাবে। বদলে শহরের অলিগলি পাকস্থলি ঘুরিয়ে দিলে খুশি হই। বসন্ সেটা বুঝে এদিক ওদিক পাক খাইয়ে হাজির করল এক বৌদ্ধ মন্দিরে। সেটার নাম ভুলে গেছি। তবে বেশ খানিকটা উঁচু থেকে দার্জিলিং শহরের একটা টুকরো দেখা যায়। তবে সকাল থেকে এতক্ষণ যে সব গলিঘুপচির মধ্যে দিয়ে এলাম, সবই বেশ পরিচ্ছন্ন। বস্তি চোখে পড়েছে। তার মধ্যে দিয়েই গেছে গাড়ি। সেখানেও পরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ার মত। একবার একটা গলি দিয়ে বেরিয়ে বাঁ দিকে টার্ন নিয়ে বসন্ বলল, 'লালকুঠি'। দেখি বেশ ভিড় আর অনেক পুলিশ। জিটিএর দপ্তর। এখন ঢোকা বেশ কঠিন।

লালকুঠি থেকে চোখ সরিয়ে বসন্‌কে জিগ্যেস করলাম, 'আলুয়ালিয়া সাহেবের কী খবর?'

বসন আমাকে অবাক করে প্রশ্ন করে 'কৌন?'

'এমপি।'

বসন্ একটু গম্ভীর থেকে বলে, 'গোর্খাল্যান্ড কি ওয়ারে মে উও কুছ নহী কিয়া।'

বসন্ যে গোর্খাল্যান্ড চায় সেটা আমি তেনজিং শিলার পাশে এক দোকানে সিগারেট টানতে টানতে জেনেছি। নাকে মুখে ধোঁয়া ছেড়ে সে বুঝিয়েছে সেটা। মমতা জি তাঁর কাছে মিত্রপক্ষ না হলেও সিচুয়েশন ভাল থাকায় সে ধন্যবাদ দিয়েছে। এটা সে অবশ্যই মানে যে গোর্খাল্যান্ড করতে গিয়ে টুরিস্ট হারালে চলবে না। অফ সিজিনে মুভমেন্ট আর সিজিনে টুরিস্ট— এটাই তাঁর কাম্য। আপাতত বিনয়বাবুর কাজে সে বেশ সন্তুষ্ট।

ঘন্টাখানেক পর রক গার্ডেনের মুখে বাঁশ-পলিথিনের তৈরি দোকানে ফলস্য বিয়ার সেবন করতে করতে দোকানির মহিলাকেও বেশ প্রসন্ন মুখে বলতে শুনলাম প্রায় একই কথা। বাকিটা তাঁর স্বামী ব্যাখ্যা করলেন। পাহাড়ের এসব দোকানিরা মৃদুভাষী হয়। তিনি মুখর হয়েছিলেন অন্য কারণে। আমি বিয়ার খাচ্ছি দেখে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে সহ্য করেছিলেন। তারপর ইশারা করতেই বৌ ভেতর থেকে একটা বোতল আর গেলাস এনে দিল। বড় মাপের একপাত্র পান করার পর কিছুক্ষণের জন্য মুখর হয়েছিলেন ভদ্রলোক।

রক গার্ডেন নিয়ে নতুন কী আর বলার আছে। তবে দার্জিলিং শহর থেকে প্রচুর ঘুরপাক খাওয়া পথে একটু নিচে নেমে আসতে হয়। এই রাস্তার অধিকাংশই বেশ খারাপ। বসন্ অবশ্য বলল যে এরমধ্যেই রাস্তাটা নতুন করে বানাবে।

বিকেলে ঘুম স্টেশানে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছি টেনিদার ঝাউ বাঙলো রহস্য-র কথা। ছোটবেলায় সেটা পড়েই প্রথম দার্জিলিং নিয়ে কৌতূহল জেগেছিল। আরেকটা উপন্যাসের কথাও মনে পড়ল। গিরিধারী কুন্ডুর লেখা 'টংসা চু'। দার্জিলিং-এ কতিপয় ঝটিকা সফর হলেও ঘুমে 'আসা' এই প্রথম। একটু আগেই দার্জিলিং থেকে জয় রাইডের ট্রেন তিনটে এসেছে। স্টেশন জমজমাট। স্টেশনের এক পাশ দিয়ে পথ চলে গেছে নেপাল সীমান্ত ছুঁয়ে মিরিক। আর পাঁচটা পাহাড়ি জনপদের মত ঘুমও তাই। হয় তো একটু বড়। রেলগাড়ি থামে। তার একটাই গর্ব। সে দার্জিলিং-এর চাইতে উঁচু। একবার ঘুমে এসে দু-দিন কাটিয়ে যেতে হবে। হাঁটব, খাব আর ঘুমোব। নো সাইট সিয়িং!

সন্ধের পর ম্যালে গিয়ে দেখি মোচ্ছবের আবহাওয়া। শীতের হাওয়ায় হাড়ে প্রায় লাগল কাঁপন। ম্যাল ছেড়ে মহাকাল মন্দিরের পথে হাঁটা ধরলাম। সরগরম ছোট্ট বাজার পেরিয়ে, মন্দিরে সিঁড়ি ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই আবছা আলোছায়াময় পথ। ডান দিকে তারার আলোয় ডুবে থাকা পাহাড়। কোথাও কোথাও আলোর বিন্দু জমাট বেঁধে আছে। কোথাও ছড়িয়ে। কোথাও মিশিমাখা অন্ধকার। নিচে আলো ঝলমল হোটেল। সাড়ে আটটা নাগাদ যখন ফিরছি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি তারা নেই।

তারপর হঠাৎ একপাল কুয়াশা লাফিয়ে পড়ল ম্যালের জমিতে। পরদিন কাক ভোরে টাইগার হিল গমন। কুয়াশা দেখে চিন্তিত হলাম। রাত তিনটেয় উঠে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখি, কোথায় কুয়াশা। উল্টো দিকের পাহাড়ে বাকি দার্জিলিং মিট মিট করছে। আকাশেও।

বসনের ফোন এল। সে সাড়ে তিনটেয় তুলবে আমাদের।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

মুসলিম রমণীদের অধিকার রক্ষার্থে সুসঙ্গত আইন আনা জরুরি !

‘তালাক’ একটি আরবি শব্দ। এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ ‘ত্যাগ করা’ কিংবা ‘বিচ্ছিন্ন করা’। ইসলামীয় আইনের পরিভাষায় তালাক শব্দটির অর্থ ‘বিবাহের বাঁধন ছেদন করা’ অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সকল সম্পর্ক স্বামীর দ্বারা ছিন্ন করা। তাই ইসলামীয় পারিবারিক আইনে আনুষ্ঠানিক বিবাহ বিচ্ছেদকে তালাক বলা হয়। এই আইনে স্বামী সর্বাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিতে পারেন। স্ত্রী কেবলমাত্র তখনই স্বামীকে তালাক দিতে পারবেন, যদি বিয়ের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক প্রদানের লিখিত অনুমতি দেওয়া হয় (তালাক-ই-তৌফিজ)। তালাক সম্পর্কে নবী(সাঃ) বলেছেন, ‘তালাক অপেক্ষা ঘৃণ্য বস্তু আল্লাহ তায়ালা আর সৃষ্টি করেননি’। তাই তালাক শরিয়তের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন চরম বিরোধ দেখা দেয়, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন যখন একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তাঁদের সম্পর্কের উন্নতিসাধনের কোনও রাস্তা যখন আর খোলা থাকে না, কেবলমাত্র তখনই এই চূড়ান্ত পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইসলামীয় আইনে।

মুসলিম সমাজে একইসঙ্গে তিনবার ‘তালাক’ উচ্চারণ করে বিবাহ বিচ্ছেদের এক প্রাচীন প্রথা (আনুমানিক ১৪০০ বছরের পুরনো) প্রচলিত রয়েছে, যাকে বলা হয় ‘তালাক-ই-বিদ্দাত’। এই পদ্ধতিতে সম্পাদিত তালাক পবিত্র কুরআন বা শরিয়ৎ অনুমোদিত নয়। পয়গম্বর মোহম্মদ এই প্রথাকে কখনই সমর্থন করেননি। বহু ইসলামীয় আইনজ্ঞ তাৎক্ষণিক তিন তালাকের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে আসছেন বহুকাল যাবৎ। এতে মুসলিম বিবাহিত মহিলাদের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়— এই মর্মে ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের এক বিশেষ সাংবিধানিক বেঞ্চ তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা রদ করবার পক্ষে রায় দেন ২০১৭ সালের ২২শে অগাস্ট।

তিন তালাক প্রথা নিয়ে ভারতে বিতর্ক অনেকদিনের। তবে বিগত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি মুসলিম নারী সংগঠন এবং কয়েকজন তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম নারীর দায়ের করা মামলাগুলোর কারণে তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা নিয়ে আবার নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। সায়রা বানো, আফরিন রহমান, গুলশান পারভিন, ইশরাত জাহান ও আতিয়া সাবরি নামে কয়েকজন তালাকপ্রাপ্ত নারী শীর্ষ আদালতে যেসব পৃথক মামলাগুলি দায়ের করেছিলেন, সেগুলোকে একত্রিত করেই সাংবিধানিক বেঞ্চ এই বিশেষ মামলাটি হাতে নিয়েছিলেন। অনেকগুলি বেসরকারি সামাজিক সংগঠন, সরকারি দপ্তর, জাতীয় মহিলা কমিশন ও অন্যান্য জনহিতৈষী ব্যক্তিরাও এই মামলায় অংশ নিয়েছিলেন।

ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জে. এস. খেহরের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ সাংবিধানিক বেঞ্চ এই মামলার বিচার করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের রায়ে তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা ‘অসাংবিধানিক’ বলে ঘোষণা করেছেন শীর্ষ আদালত। এই প্রকারের তিন তালাক প্রথা ইসলাম

শীর্ষ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ লোকসভায় পাস হয় মুসলিম মহিলা বিল, ২০১৭। এই বিলে তাৎক্ষণিক তিন তালাককে বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিলটি আইনে পরিণত হলে জামিন-অযোগ্য ফৌজদারি অপরাধের তকমা পাবে তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত স্বামীর তিন বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং/অথবা জরিমানা হতে পারে।

ধর্মপালনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত নয় বলেও জানিয়েছেন ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পর ভারতে তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক তিন তালাককে ফৌজদারি অপরাধের তকমা দিয়ে জেল-জরিমানার ব্যবস্থা করতে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাদেশ এনেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার।

শীর্ষ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ লোকসভায় পাস হয় মুসলিম মহিলা (বিবাহ সংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষা) বিল, ২০১৭। এই বিলে তাৎক্ষণিক তিন তালাককে বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিলটি আইনে পরিণত হলে জামিন-অযোগ্য ফৌজদারি অপরাধের তকমা পাবে তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত স্বামীর তিন বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং/অথবা জরিমানা হতে পারে। নিজের এবং নাবালক পুত্র-কন্যাদের জন্য খোরপোষ ও অভিভাবকত্বের আর্জি জানিয়ে আদালতে যেতে পারবেন সেই স্ত্রী। কোনও মুসলিম স্বামী মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে কিংবা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে, যেমন ই-মেল, এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে স্ত্রীকে তাৎক্ষণিক তিন তালাক দিলে তা হবে অবৈধ এবং অকার্যকর।

এই আইনের যাতে অপব্যবহার না হয়, সেই লক্ষ্যে লোকসভায় পেশ করবার আগে বিলটিতে তিনটি সংশোধন করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। প্রথমত, স্বামীর বিরুদ্ধে একমাত্র স্ত্রী বা তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাই পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, মামলা শুরু পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ফের সমঝোতা হয়ে গেলে স্ত্রী সেই মামলা তুলেও নিতে পারবেন। তৃতীয়ত, একমাত্র স্ত্রীর বক্তব্য শুনেই অভিযুক্ত স্বামীকে জামিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন ম্যাজিস্ট্রেট।

সংশোধিত বিলটিতে আরও একটি বিতর্কিত প্রথা ‘নিকাহ হালালা’-কেও দণ্ডনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘নিকাহ’ শব্দের অর্থ হল, একত্রিত হওয়া বা নারী-পুরুষ মিলিত হওয়া। পারিভাষিক অর্থ বিবাহ। ‘হালাল’ শব্দের অর্থ হল পবিত্র। কিন্তু দুয়ে মিলে যেটা হয়, তার থেকে অপবিত্র ও নোংরা প্রথা বোধহয় আর দ্বিতীয়টি নেই! তালাক পাওয়ার পরও যদি মুসলিম মহিলাদের প্রাক্তন স্বামীর কাছে ফিরতে হয় তবে তাঁকে দ্বারস্থ হতে হবে এই নিকাহ হালালা প্রথার। সেক্ষেত্রে অন্য কোনও পুরুষকে বিয়ে করতে হয় তালাকপ্রাপ্ত রমণীকে। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাসও করতে হবে ওই মহিলাকে। এবার এই দ্বিতীয় স্বামী যদি তালাক দেন তাঁর স্ত্রীকে, তখন মহিলাটি আবার তাঁর প্রথম স্বামীকে নিকাহ করতে পারবেন। এ প্রথা মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত। তালাকের কুফল যাতে জীবনভর সহ্য না করতে হয়, সে কারণে অনেক মহিলাই বাধ্য হয়ে এই প্রথা মেনে নেন, আর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অচেনা পুরুষের স্ত্রী হয়ে যান কিছুদিনের জন্য। আদতে ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হতে হয় মুসলিম মহিলাদের!

‘তিন তালাক’, ‘নিকাহ হালালা’ ও ‘বহু বিবাহ’ প্রথা মুসলিম পুরুষদের চরম স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন। ইসলামিক বিশ্বের অধিকাংশ দেশগুলিতে এই কুপ্রথাগুলি আজ বাতিলের খাতায়। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, অবিরত মহিলাদের ক্ষমতায়নের জিগির তোলা একবিংশ শতাব্দীর ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ভারতের মাটিতে, এমন কুপ্রথাগুলি দিব্যি চালু আছে! নিঃসন্দেহে এ বড়ই অনৈতিক, অমানবিক ও লজ্জাজনক। জাত-ধর্ম নির্বিশেষে নারী স্বাধীনতার পথে এ এক বিষম বাধা। মুসলিম রমণীদের অধিকার রক্ষায় এই প্রথাগুলি বন্ধের আবেদন বারবার উঠে এসেছে প্রগতিশীল মুসলিম সমাজের মধ্যে থেকেই। যদিও কিছু রক্ষণশীল মুসলিম সংগঠন এখনও মনে করছেন, এই প্রথাগুলি রদ হলে আঘাতপ্রাপ্ত হবে ইসলাম ধর্ম!

অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। এবার আমাদের বোঝবার সময় এসেছে— ধর্ম মানুষেরই তৈরি, ধর্মীয় নিয়মনীতিও মানুষের প্রয়োজনে মানুষেরই তৈরি। কোনও কিছুই মানুষের ঊর্ধ্বে নয়। তাই মানুষের আত্মসম্মান যেখানে পদদলিত হয়, সেখানেই প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়, সেখানেই গর্জে ওঠা জরুরি। ২০১৭ সালের ২২ অগাস্ট শীর্ষ আদালতের ঐতিহাসিক রায় এবং ২০১৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর সংশোধিত মুসলিম মহিলা (বিবাহ সংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষা) বিলের লোকসভায় পাস হওয়ার ঘটনা, সেদিক থেকে নিঃসন্দেহে দুটি বিরাট মাপের পদক্ষেপ— অনেক বঞ্চনা, অনেক জমা কান্না আর অসম্মানের উত্তর। এখন একটি পূর্ণাঙ্গ আইনের আশায় ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছেন সকল বঞ্চিত মুসলিম নারী তথা ভারতের সচেতন জনগণ। এ কথা সত্যি, অনেকদিন আগেই এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া উচিৎ ছিল, তবে সেই প্রাচীন ইংরেজি প্রবাদ ভুলে গেলে চলবে না— ‘বেটার লেইট দেন নেভার’ অর্থাৎ কোনও কাজ একেবারেই না করা অপেক্ষা বিলম্বে হলেও করাটাই শ্রেয়!

রাখি পুরকায়স্থ (আইন বিশেষজ্ঞ)
rakhe.pur@gmail.com

পৌষের মিঠা ঘ্রাণ

দেশ জুড়ে পৌষ সংক্রান্তি উদ্‌যাপন রীতি যুগ যুগ ধরে

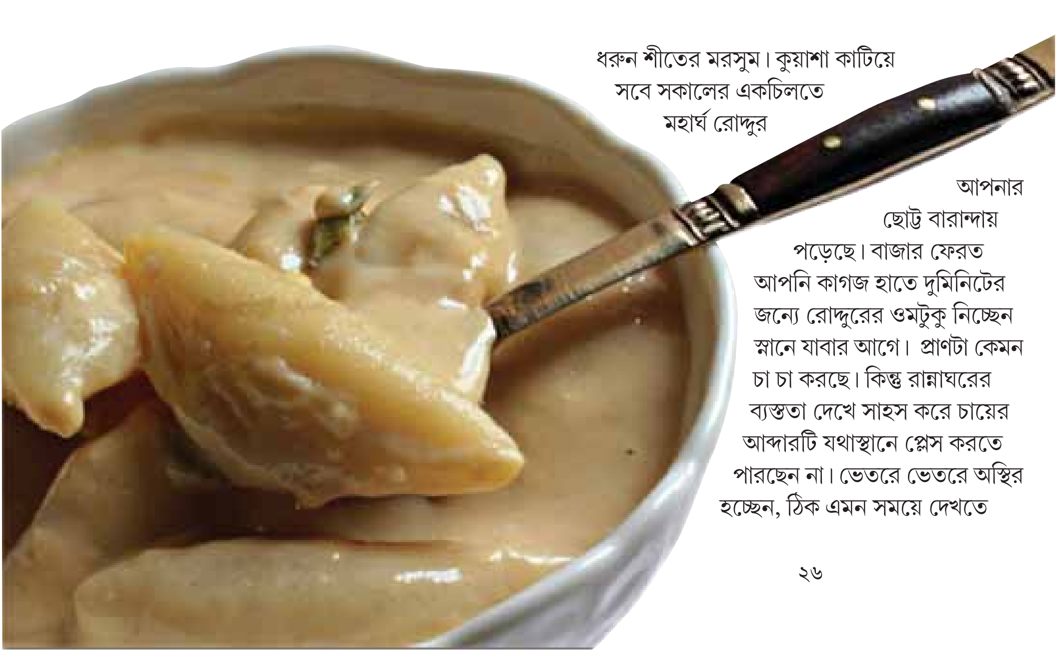

ধরুন শীতের মরসুম। কুয়াশা কাটিয়ে সবে সকালের একচিলতে মহার্ঘ রোদ্দুর আপনার ছোট্ট বারান্দায় পড়েছে। বাজার ফেরত আপনি কাগজ হাতে দুমিনিটের জন্যে রোদ্দুরের ওমটুকু নিচ্ছেন স্নানে যাবার আগে। প্রাণটা কেমন চা চা করছে। কিন্তু রান্নাঘরের ব্যস্ততা দেখে সাহস করে চায়ের আব্দারটি যথাস্থানে প্লেস করতে পারছেন না। ভেতরে ভেতরে অস্থির হচ্ছেন, ঠিক এমন সময়ে দেখতে পেলেন মেয়ে হাসিহাসি মুখে বারান্দায় এল। হাতের ট্রেতে শুধু চা নয় ধোঁয়া ওড়ানো টায়ের সুসজ্জিত প্লেটও রয়েছে যে! সাদা ধবধবে প্লেটের ওপর একটুকরো সবুজ কলাপাতা ,তারই একধারে গোটা চারেক ফুটফুটে ভাপা পিঠে, নারকেল কোড়া আর খানিক খেজুর গুড়। শুধু জিভে নয় চোখের কোনটাও ভিজে যায় নাকি ! বালকসুলভ আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায়! অভাবিত এই উপহার, ঘরের মানুষটিকে নতুন করে বড্ড ভাল লাগে। ঠিক কিনা বলুন।"বাবা, আজ টিফিনে পিঠে কিন্তু, বিকেলে পাটিসাপটা আর পায়েস হবে। মা অফিস থেকে ফিরে করবে।" হুম, আজ পৌষসংক্রান্তি তো !

একটা কাল্পনিক দৃশ্য আঁকলাম। আজকের ব্যস্ত মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবি বাঙালি জীবনে পৌষপার্বণ পালিত হয় বৈকি। নলেনগুড়, চালের গুড়ো, নারকেল কোরা

আর দুধ সহযোগে নানা রকম পিঠেপুলি আজকের এই জেটযুগের গৃহিণীরাও তৈরি করেন, পিঠেপুলি সংক্রান্ত নানা পরীক্ষানিরীক্ষাও করেন তারা। আসলে যুগযুগান্ত ধরে বংশপরম্পরায় টিকে থাকে আমাদের জাতিগত সংস্কৃতি, কৃষ্টি, নানা সামাজিক বা ধর্মীয় রীতি-প্রথা-নিয়ম-আচার। সময়ের প্রেক্ষিতে তার ধরণধারন খানিক পাল্টে যায় এই আরকি। তবে আমাদের বাংলার কৃষিজীবি বা মাটিলগ্ন মানুষ পরম শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে পারিবারিক বা সামাজিক সূত্রে প্রাপ্ত পৌষসংক্রান্তির ব্রত পালন ও পূজাপাঠ করেন প্রকৃত নিয়ম নিষ্ঠায়।

বছর পঞ্চাশের শান্তি দিদি। শান্তি মন্ডল, গৃহ সহায়িকা হয়ে আমাদের পরিবারের সঙ্গে বহুকাল ধরেই সম্পর্কিত। তার ঠাকুরদাদার আমলে পূর্ববাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এপারে এসেছিলেন। স্বামী, ছেলে, বৌ, নাতি নাতনি নিয়ে ভরা সংসার। খেটে খাওয়া পরিবারটি মোটামুটি সচ্ছল। চাষের খানিক জমি, গোয়ালে গরু বড়সড় উঠোনের চারদিক ঘিরে ঘরদোর সবই আছে। তার বাড়ির পৌষসংক্রান্তির উৎসবে পুজোয় নিমন্ত্রণ খেয়েছি। পুজোর নিয়ম কানুন বেশ কড়া। সংক্রান্তির দিন মাটি খনন করা যাবে না। তাই আগের দিন সারা বাড়িঘর গোবর মাটি দিয়ে লেপেপুছে ঝকঝকে, তুলসিতলায় একটা ছোট মাটির উনুন বানিয়ে রাখা হয়েছে। আর পাটকাঠির মাথায় একটা গাঁদাফুল দুপাশে দুটো গাঁদাফুল লাগিয়ে বাস্তুদেবতার প্রতীকী মূর্তিটি সেখানে মাটিতে সামান্য গর্ত করে পুঁতে রাখা হয়েছে। পৌষসংক্রান্তির দিন সক্কালবেলা সূর্যোদয়ের আগে স্নান সেরে আম্রপল্লব দিয়ে বাস্তুপূজার ঘট বসানো রীতি। সামনেই সূর্যদেবতাকেও পিঠে উৎসর্গ করতে হয়, চালের গুড়ো জলে গুলিয়ে নতুন মাটির কল্কে তাতে ডুবিয়ে সাতটা সুগোল ছাপ বা পিঠে বানিয়ে ধানদূর্বা দিয়ে মাটিতে গড় হয়ে সূর্যদেবতাকে প্রণাম করতে হবে। এবারে বাস্তুপূজা ও নবান্ন। ফলমূল ও পূজার অন্যান্য উপকরণ তো থাকবেই, সঙ্গে নতুন চালের পায়েস রান্না করে বাস্তুদেবতাকে নিবেদন করা হয়, নবান্ন। আর আছে গোরুর পুজো, সেটা করবেন বাড়ির পুরুষ সদস্য। সে পূজাও সূর্যোদয়ের আগে স্নান সেরে চালের গুঁড়ো দিয়ে ভাপা পিঠে বানিয়ে সবার আগে গরুদের খাওয়ানোর নিয়ম। পরে বাড়ির কেউ খেতে পারে। গরুদের স্নান করিয়ে ফুলের মালা, ধান দূর্বা দিয়ে প্রণাম করতে হবে। তারপর সারাদিন নানা ধরনের পিঠে ভাজা, খাওয়া চলতেই থাকে। দুধপুলি, পাটিসাপটা, পোয়াপিঠে, তিলের কদমা, সে আরও নানা প্রকার সুস্বাদু পিঠে হয়। আর আশপাশের সব বাড়িতেই প্রায় এমনই নিয়ম। সবার বাড়ির সামনেই চালের গুঁড়ো দিয়ে আলপনা আঁকা, তাতে ধান দূর্বা আর গাঁদাফুল দিয়ে পুজো করা হয়েছে। আসলে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের মূল সুরটি পৌষসংক্রান্তির ব্রতপালনের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় আজকের এই সময়েও। ভূমি, সূর্য, গাভী, অন্ন এসবই পূজ্য।

পৌষসংক্রান্তি বা মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষেই মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকারে উদযাপনের রীতি যুগযুগান্ত ধরেই চলে আসছে। পৌষমাসের শেষ দিনটিই এই মকরসংক্রান্তি। এইদিন সূর্য মকররাশিতে প্রবেশ করে। সূর্যের এবারে উত্তরায়ণ পর্ব শুরু। এই দিনটি মহাসমারোহে পালিত হয় ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রদেশে। আসামে মাঘিবিহু বা ভোগালি বিহু। এটি মূলত ফসল কাটার উৎসব। তামিলনাড়ুতে পালিত হয় এই দিন থাইপোঙ্গল উৎসব। চারদিন ধরে নানা পর্বে সংক্রান্তি পালিত হয়। মূল অনুষ্ঠান দ্বিতীয় দিনে, মকর সংক্রান্তি। বাড়ির সামনে নানা রং দিয়ে অপূর্ব সব রঙ্গোলি বা আলপনা আঁকা হয়। ফুল, মালা, আম্রপল্লব দিয়ে ঘরবাড়ি অলংকৃত করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানাতে, ছত্তিশগড়, ওড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, গোয়া, মণিপুর, রাজস্থান, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু, হরিয়ানা, হিমাচল কোথায় নয়? গুজরাটে এইদিন পালিত হয় উত্তরায়ণ। হরিয়ানা, হিমাচল, পাঞ্জাবে পালিত হয় এই দিন মাঘি উৎসব। পশ্চিমবঙ্গে পৌষসংক্রান্তি, এমনকি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও এই একই নামে উৎসব হয়। নেপালে মাঘি সংক্রান্তি বা মাঘি এমনকি পাকিস্থানের সিন্ধুপ্রদেশে এইদিন তিরমুরি পালিত হয়। আমাদের উত্তরপ্রদেশেও চারদিন ধরে চলে মকর সংক্রান্তির নানান রীতিনিয়ম সহ পূজা। তিল ও গুড়ের লাড্ডু খাওয়া, ঘুড়ি ওড়ানোর চল আছে এই উপলক্ষে।

আর মকরসংক্রান্তির মাহেন্দ্রক্ষণে গঙ্গায় অবগাহন ও পুণ্যলাভের গভীর বিশ্বাস সেও তো পুরুষানুক্রমে চলে আসছে এই ভারতবর্ষে। গঙ্গাসাগর মেলা, লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড়। পুলিশ প্রশানের দিনরাত্রির ঘুম উড়ে যায়। এক বারো বছর অন্তর পূর্ণকুম্ভ বা ছ'বছরের অর্ধকুম্ভের স্নান, সে এক বিপুল আয়োজন! এলাহাবাদ, বারাণসী বা হরিদ্বারের গঙ্গায় ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান। কোন সে গভীর বিশ্বাসে লক্ষ মানুষ ছুটে যায়! পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাসাগরে, যেখানে গঙ্গা এসে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে, প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ পৌষসংক্রান্তির ভোরে পূণ্যস্নানে আসেন। ওই ভয়ংকর শীতের ভোরে কী অপূর্ব ভক্তিতে তারা প্রচন্ড শীতল জলে পূণ্যস্নান করেন! কী গভীর বিশ্বাস !

এবারে আমাদের বাংলার উত্তরের কথা বলি। রাজবংশী বন্ধুর বাড়িতেও পৌষের পিঠে খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। এইদিন নয়াখই বা নতুন চালের অন্ন খাওয়ার চলও আছে। অনেকটাই কৃষিসংক্রান্ত লোকাচার। জমির ধান আঁটিবদ্ধ কেঁড়ে বাহির উঠোনে রাখা হয়। পুযুরা বা পুষণা শুরু করার আগে রাজবংশী নারীরা পিঠে ও তেলুয়া কলাপাতায় ঢেকে রেখে দেন ওই ধানের পুঞ্জির ওপর। বিশ্বাস ক্ষেতিলক্ষ্মী এই সময় ধানের স্তুপের ওপর বিরাজ করেন। তিলের গুঁড়োর সঙ্গে গুড় জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় এই তেলুয়া পিঠে।

এইদিন বাস্তু পুজোও হয়, অধিকারী এসে বাড়িতে পুজো করে যান।

পুজোর আগে সারা বাড়িতে গোবরছড়া দিতে হয়। সংক্রান্তির আগের দিন বা সেদিন ভোরে বাড়িঘর গোবর মাটি দিয়ে লেপেপুঁছে একেবারে ঝকঝকে। ঘুম ভাঙবে ধুপধাপ সামগাইনে চালের গুঁড়ো করার শব্দে। সংক্রান্তির ভোরে সূর্যোদয়ের আগে গরুকেও স্নান করিয়ে ফুল, গাঁদাফুলের মালা, ধানদূর্বা দিয়ে পুজো করতে হবে। লাউয়ের বোটার দিকটা কেটে জলে গোলানো চালের গুঁড়ো দিয়ে গরুর গায়ে ছাপ দেওয়া বা পিঠা দেওয়ার নিয়ম। বাড়ির সবাই কালো তিল ভেজানো জলে ভোরেই স্নান করবে। আদা, গুড়, তিল একসঙ্গে সামগাইনে কুটে চাটনির মতো বানানো হয়, চালের গুড়োয় তৈরি সাদা বা ভাপা পিঠের সঙ্গে খাওয়ার নিয়ম। এছাড়া চালের গুড়ো, আটা, গুড়, তিল মিশিয়ে তেলে ভাজা পোয়া পিঠে বা তেলেপিঠেও অতি সুস্বাদু।

তো এই পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির পূজাপাঠে একদিকে যেমন নিয়ম আচারগুলি অবশ্য পালনীয়, অপরদিকে নানা স্বাদের খাবার দাবার রসনার তৃপ্তিও বটে। ভারতবর্ষ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ তো বটেই, তারই মূল্যবান উত্তরাধিকার বহন করে চলেছি আমরা ভারতীয়রা এই পূজাপার্বণ বা নিয়ম আচার সারা দেশের মানুষকে কোথায় যেন আত্মীয়তার সূত্রে বেঁধে রেখেছে; এই বোধ খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওই পৌষের প্রবল শীতল জলে অবগাহন কালে।

রাজনীতির আর ধর্মের নামে বিচ্ছিন্নতার মন্ত্রপাঠ করান যে সমস্ত ধর্মীয় ও রাজনীতির নেতারা তারাও নিশ্চয়ই খেয়াল করবেন যে অঞ্চলে, রাজ্যে বা ভিন্ন রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর আত্মীয়তার সুর কিন্তু বিদ্যমান। আর সাধারণ মানুষ যাদের শ্রম ও ঘামের ওপর টিকে থাকে তথাকথিত সভ্যতা সেই জনসাধারণ প্রকৃতি মায়ের সন্তান, এই সন্তান মাটিতে না নামলে হাল না ধরলে উপবাসি থাকবে জগজ্জন। তাই রাজনীতির নেতা বা মন্দিরের পুরোহিতের হাতে মন্দিরের দেবতাকে পুজো দেওয়ার আগে গভীর শ্রদ্ধায় তাঁরা পুজো করেন কৃষিক্ষেত্রকে, ভূমিকে, বাস্তুকে, সূর্যকে, হাল ও লাঙ্গলকে। অবগাহন করেন জগত ও জীবনের মূলগতিধারায়। সাগরে কিংবা নদীতে।

তনুশ্রী পাল

ফিরে ফিরে আসে

রম্যাণী গোস্বামী

উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে আমার গোটা শৈশবটা কেটেছে ডুয়ার্সের কোলে। প্রথমে জলপাইগুড়িতে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। তারপর রায়কত পাড়ায় নিজেদের বাড়ি তৈরি হল। বাবা-মায়ের হাত ধরে আমি আর আমার বোন চলে এলাম সেখানে। তখন আমরা খুবই ছোট। পাঁচ কী ছয় বছর বয়স। তবুও সেই সময়ের কিছু স্মৃতি মনের খাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে এখনও। মনে পড়ে আমাদের বাড়ি ছিল একতলা। তার সামনে এবং পিছনে অনেকটা জায়গা ছেড়ে রাখা হয়েছিল বাগান করার জন্য। পাঁচিল ঘেরা সীমানা। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে পরপর দাঁড়িয়ে আছে সুপুরি গাছ, নারকেল গাছ। একখানা কাঁঠাল গাছ আর শিউলি গাছও ছিল। এছাড়া পিছনের জমিতে নানা ধরনের মরসুমি ফুলের চারা মা নিজে হাতে লাগিয়েছিলেন অতি যত্নে।

বাড়ির দোতলায় ছিল একখানা চিলেকোঠার ঘর। তার উপরে টিনের চাল। আমরা যখন নতুন বাড়িতে উঠে এলাম তখন জুলাই মাস। ঘোর বর্ষা। জলপাইগুড়ির আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে আছে। নাগাড়ে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। কখনও ঝমঝম বা কখনও টিপটিপ। দোতলায় টিনের চালে অনবরত বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ে অদ্ভুত এক ধ্রুপদী স্বরের সৃষ্টি করেছে। দুই বোন মুগ্ধ হয়ে শুনি। রাতের দিকে বৃষ্টির সঙ্গে আরম্ভ হল ঝোড়ো হাওয়া। টিনের চালের ফাঁক দিয়ে সেই দ্রুতগামী হাওয়া বয়ে গেলে তীক্ষ্ণ শিসের মত শব্দ জাগে। সেই শব্দে বুকের ভিতরটা ছমছম করে ওঠে কেমন। টানা চারদিন ধরে চলল সেই বৃষ্টি। শোনা গেল দিনবাজারে জল উঠেছে। পান্ডাপাড়া, সুহৃদ লেন এসব জায়গায় নাকি লোকের বাড়ির ভিতরেও জল থইথই করছে। সেবারই

ডুয়ার্সের মেয়েবেলা

প্রথম ডুয়ার্সের বৃষ্টির সঙ্গে আমার পরিচয়।

এদিকে ঘরে আনাজপত্র কিচ্ছু নেই। বাবা হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে ব্যাগ হাতে চললেন বাজারে। কিছু আলু আর ডিম। ব্যস। এই দিয়েই চালাতে হবে। শোনা যাচ্ছে জল আরও বাড়বে। বইপত্র, ট্রাঙ্ক, বিছানা, তোশক এসব দোতলায় তোলা হবে কিনা তা নিয়ে বাবা এবং মায়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কানে এল, কিন্তু ওসব আমাদের তেমন ছুঁল না। আমরা দুই বোন রান্নাঘরের মেঝেতেই মাদুর পেতে থেবড়ে বসেছি। গ্যাসের কানেকশন তখনও আসে নি বাড়িতে। মা স্টোভ জ্বালিয়েছেন। রাতে মুগ ডালের খিচুড়ি আর ডিম কষা। সঙ্গে বেগুন ভাজা। বিকেল থেকে পাওয়ার কাট। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

রাতটা মনে পড়ে এখনও। বাবা মাঝেমাঝে টর্চ হাতে বেরিয়ে যাচ্ছেন বারান্দায়। জোরালো টর্চের আলো ফোকাস করছেন রাস্তার দুই ধারের উপচে পড়া ড্রেনে। সেখানে প্রবল বেগে ফুলে ফেঁপে জল বয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ, জলের সোঁ সোঁ শব্দ - এছাড়া বিশ্বচরাচরে আর কোনও আওয়াজ নেই। আমরা দুই বোন রান্নাঘরে বসে জ্বলন্ত স্টোভের ওম নিচ্ছি শরীরে। বাবা এসে মায়ের কাছে গরম গরম চায়ের ফরমায়েশ করছেন। তারপর এতবড় বাটিতে মুড়ি মাখা হল সর্ষের তেল দিয়ে। বাবা গল্প শোনাচ্ছেন। ভূতের গল্প, অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। আমরা হাঁ করে শুনছি। সেই সময়ই প্রথম শুনেছিলাম সেপ্টোপাসের খিদে। রতনবাবু আর সেই লোকটা। শুনেছিলাম খগম। পরে বারবার পড়েছি সত্যজিৎ। ভেজা ভেজা আধো আলো আধো অন্ধকারে ডোবা ছমছমে রাতটাই যেন ফিরে ফিরে এসেছে মনে।

তার পরদিনই বন্যা হল শহরে। তারও দিন তিনেক পরে যখন জল সম্পূর্ণ নেমে গেল, আমরা গুটিগুটি স্কুলে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। ক্লাসরুমে, হাই বেঞ্চে, টেবিলে, স্কুলের বারান্দায় সর্বত্র পুরু পলির আস্তরণ! নরম তুলতুলে পলি'তে পা গেঁথে যায়। জুতো মোজা খুলে ওই মসৃণ বুকে পা রাখি। বুড়ো আঙুল দিয়ে খোদাই করি নিজের নাম। আর কী? এবার অঘোষিত ছুটি। আমাদের আনন্দ দেখে কে? নাচতে নাচতে দুই বোন বাড়ি ফিরলাম। স্কুলের দিনগুলো খুবই উপভোগ করেছি। নববর্ষে বন্ধুদের নিজে হাতে কার্ড বানিয়ে দেওয়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া, সরস্বতী পুজোতে আলপনা দেওয়া, নানা মধুর স্মৃতি। মনে আছে সরস্বতী পুজোর আগের দিন নানা কাজকর্মে রাত হয়ে গিয়েছিল। বাইরে তখন অন্ধকার। স্কুল করিডরে, ঘরের ভিতরে টিউব জ্বলছে। দিনের আলোয় রোজ যেখানে কতটা সময় থাকি, সেদিন জায়গাটাকে খুব অদ্ভুত লাগছিল। মনে হচ্ছিল

যেন অন্য কোনও গ্রহে চলে এসেছি।

আমাদের বাড়ির পিছনের বাগানের কথা আগেই বলেছি। মা সেখানে রকমারি সব্জিও ফলাতেন। তখন শীতকাল। আর যে সে শীত নয়। জলপাইগুড়িতে তখন কিছু মারকাটারি শীতও পড়ত। সকাল থেকে কুয়াশা। দুপুর বারোটা অবধিও চার হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না, এমন ঘন, এমনি নিরেট। বেলা বাড়লে হয়ত ফিকে রোদের ছিটে দেখা গেল মলিন আকাশে, তারপর আবার যে কে সেই। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট শুনশান। ভূতুড়ে কুয়াশা কেবল পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়ায় একলা ল্যাম্পপোস্টটাকে জড়িয়ে ধরে। করলা নদীর বুকে দু'হাত সমান ধোঁয়াটে জলীয় স্তর, দেখলে ভয় ভয় করে। তা একবার আমাদের দু'বোনের ভারি ইচ্ছে হল পিছনের বাগানে শীতের মিঠে রোদে বসে চড়ুইভাতি করব। কথামতো কাজ। উনুন খোঁড়া হল। হাঁড়ি কড়াই জোগাড় হল। টেনিদা, হাবুল, প্যালারামের মত একখানা কম বাজেটের মেনুও ঠিক করলাম মাথা ঘামিয়ে। কিন্তু রান্না করতে গিয়ে দেখা গেল যে গোড়াতেই গলদ। উনুন ধরাব কীভাবে? জ্বালানি কোথায়? সে ব্যবস্থাই তো করা হয়নি। ব্যাপারটা দুজনের কারোর মাথায় নেই যে! মাঝখান থেকে মায়ের লাগানো মটরশুঁটি গাছগুলোর দফারফা। কচি কচি মটরদানা যত পেয়েছি পটাপট ছিঁড়ে মুখে চালান। কী মিষ্টি তার স্বাদ। আবার হাঁড়ি কড়াই নিয়ে যথাস্থানে ফেরত। হয়ে গেল চড়ুইভাতি।

ছোটবেলায় বড়দের সঙ্গে সত্যিকারের পিকনিকেও গিয়েছিলাম। একবারের ঘটনা খুব মনে পড়ে। বাবাদের অফিস থেকে ডায়না নদীর ধারে বাস শুদ্ধ লোক মিলে পিকনিকে যাওয়া হয়েছে। জানুয়ারির শেষাশেষি। কনকনে হাড়কাঁপানো হাওয়া। ঝকঝকে নীল আকাশ। দূরে উজ্জ্বল সবুজ ভুটান পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে রাস্তা, রোদ ঠিকরানো টিনের চাল চকচক করছে। বাস নেমে গিয়েছে রিভারবেডে। কী অপূর্ব নদী। পাহাড়ি নদীর তিরতিরে স্বচ্ছ জল ভেদ করে দেখা যাচ্ছে তার বুকের গভীরে থাকা রঙবেরঙের নুড়িপাথর। একদল কচিকাঁচাদের সঙ্গে আমরাও খেলায় মেতে উঠেছি। কেউ কেউ হেঁটে নদী পার হয়ে চলে গেল ওপাশে। গিয়ে কেমন হাত নাড়ছে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে। বিশাল বড় হাঁড়িতে রান্না বসেছে। মা-কাকিমা'রাও হাত লাগিয়েছে। সঙ্গে চলছে অন্তাক্ষরি। যে যেমন পারে ভুলভাল গান গাইছে। হাহা হিহি চলছে। এসব করতে করতে কখন বেলা ফুরিয়ে এল। আমাদের শেষ হয়ে বড়দের খাওয়া দাওয়া পর্ব শুরু হয়েছে সবে। এমন সময় কোনও রকম আগাম সঙ্কেত না দিয়ে আকাশ ভেঙে হু হু করে নেমে এল অসময়ের বৃষ্টি। বড়রা সবাই থালা হাতে দৌড় দৌড় দৌড়। আমি তখনও তাকিয়ে দেখছি দূরের পাহাড়টাকে। দেখতে দেখতে একটু আগের সবুজ পাহাড় ঢেকে গেল মেঘে। এখন আবছা হয়ে জলছবির মত ভেসে আছে ধোঁয়া ধোঁয়া পাহাড়। পাহাড়ের উপরের দিকটা ঘন অন্ধকার। আর কাচের মত পরিষ্কার সেই নদীর জলের রঙ নিমেষের মধ্যে পালটে গিয়ে এখন কুচকুচে কালো, ঘোলা, আয়তনে বেড়ে গিয়ে ভয়ানক স্রোত তার। একটু আগের চেনা পাহাড়, চেনা নদী, চেনা প্রকৃতির হঠাৎ কেমন রূপ বদল ঘটে গিয়েছে। আমার শিশুমনে সেই ঘটনা এক অদ্ভুত প্রভাব ফেলেছিল।

তার কিছুদিন পরেই বিভূতিভূষণের আরণ্যক পড়লাম। এবং ডুয়ার্সের প্রকৃতিকে নিটোল ভালবেসে ফেললাম।

আকাশ দেখতে কী ভীষণ ভাল লাগত সেই ছোট্টবেলা থেকেই। কিছু না করে স্রেফ ছাদে বসে বসে আকাশ দেখতাম। গল্পের বইয়ের পোকা ছিলাম। যা পেয়েছি হাতের কাছে সব পড়েছি। এটা বড়দের লেখা, এই লেখা ছোটদের জন্য নয়, এসব মানা হত না আমাদের বাড়িতে। লীলা মজুমদার যেমন গোগ্রাসে গিলেছি তেমনি ওই বয়সেই পড়ে ফেলেছি মৈত্রেয়ী দেবীর ন হন্যতে। মেয়ে বলে বাড়তি কোনও বিধিনিষেধও চাপানো হয়নি কোনওকালে। যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়েছি। ছোট থেকেই আমরা দুই বোন আমাদের ভাললাগা ও মন্দলাগাকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছি। ছোটদের নিজস্ব মতপ্রকাশকে সবসময় প্রশ্রয় দিতেন বাবা-মা। যে কাজই করতাম না কেন, যুক্তি দিয়ে মনে মনে তার কারণ বিশ্লেষণ করতাম। অন্যায় করে থাকলে তা স্বীকার করতাম অকপটে। বাবা আমাদের চিরকাল অকপট থাকতে শিখিয়েছেন।

আকাশ দেখতে কী ভীষণ ভাল লাগত সেই ছোট্টবেলা থেকেই। কিছু না করে স্রেফ ছাদে বসে বসে আকাশ দেখতাম। গল্পের বইয়ের পোকা ছিলাম। যা পেয়েছি হাতের কাছে সব পড়েছি। এটা বড়দের লেখা, এই লেখা ছোটদের জন্য নয়, এসব মানা হত না আমাদের বাড়িতে। লীলা মজুমদার যেমন গোগ্রাসে গিলেছি তেমনি ওই বয়সেই পড়ে ফেলেছি মৈত্রেয়ী দেবীর ন হন্যতে। মেয়ে বলে বাড়তি কোনও বিধিনিষেধও চাপানো হয়নি কোনওকালে। যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়েছি।

ভীষণ ভাল লাগত ঘুরে বেড়াতেও। ডুয়ার্সের জঙ্গলে প্রথমবার গিয়েছিলাম খুব ছোট থাকতে। কালো পিচের রাস্তা জঙ্গল চিরে চলে গিয়েছে সোজা। দুপাশে উঁচু উঁচু গাছের সারি। রোদের ফালি বর্শার মত গাছপালা ভেদ করে এসে পড়ছে মাটিতে। উচ্চ কম্পাঙ্কে ডাকছে ঝিঁঝি। একটা নজরমিনারে উঠেছি আমরা। সামনেই বিশাল এক জলাশয়। তাকে ঘিরে নিশ্ছিদ্র বনানী। বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। সবারই মনে তীব্র প্রতীক্ষা। কেউ জোরে কথা বলছে না। ফিসফিস ফিসফিস। হঠাৎ চাপা গলায় কেউ বলে উঠল, এসেছে, এসেছে...

তাকিয়ে দেখি জলার ধারে রাজকীয় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে একটি মা বাইসন। তার বিশাল দুটো শিং। সঙ্গে ছানাপোনা। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় প্রকৃতির এক অসাধারণ ক্যানভাস।

আরও একবার গিয়েছিলাম চা বাগানের একেবারে ভিতরে। ফ্যাক্টরিতে চা প্রসেস করা হচ্ছিল। আমাদের সেইসব কর্মকাণ্ড নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্যও হয়েছিল। ভীষণভাবে মনে পড়ে চা পাতার মাদকতাভরা গন্ধটা। বড় বড় ট্রেতে রাখা চা পাতা রোলিং মেশিনে চড়ে চলে যাচ্ছে। ঘরঘর একটানা শব্দ। আর চা পাতার তীক্ষ্ণ ঝাঁঝাল গন্ধ। এখনও যেন নাকে ভেসে আসে গন্ধটা।

এর অনেক পরে জলপাইগুড়ি ছেড়ে কলকাতায় চলে গেলাম পড়াশোনার জন্য। তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। ওখানে সব ভাল। কিন্তু ওরা যেন বড্ড কেজো, ভীষণ রকম শহুরে। আমার কিছুদিন পরপরই হাঁফ ধরে যায়। ডুয়ার্সের নির্মল নীল আকাশ, এখানকার বাতাসের মনমাতানো গন্ধ, সবুজ সতেজ গাছে ঘেরা শান্ত দীঘির পাড়, এরা আমার ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন হয়ে জেগে মনের অতলে ঘাই মারে। বেশিদিন থাকতে পারি না। মাঝেমাঝেই ছুটি নিয়ে পালিয়ে আসি। ভোরবেলায় ট্রেন সিগনাল না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয় আলুয়াবাড়ি জংশনে। ঘুমচোখে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে যখন দেখতে পাই নীল আকাশের বুকে জেগে আছে প্রাণের কাঞ্চনজঙ্ঘা, মনটা নিমেষে ফুরফুরে হয়ে ওঠে গোলাপি হাওয়া মিঠাইয়ের মত। বুঝতে পারি এই আমার জায়গা। আমার প্রাণের মিলনস্থল।

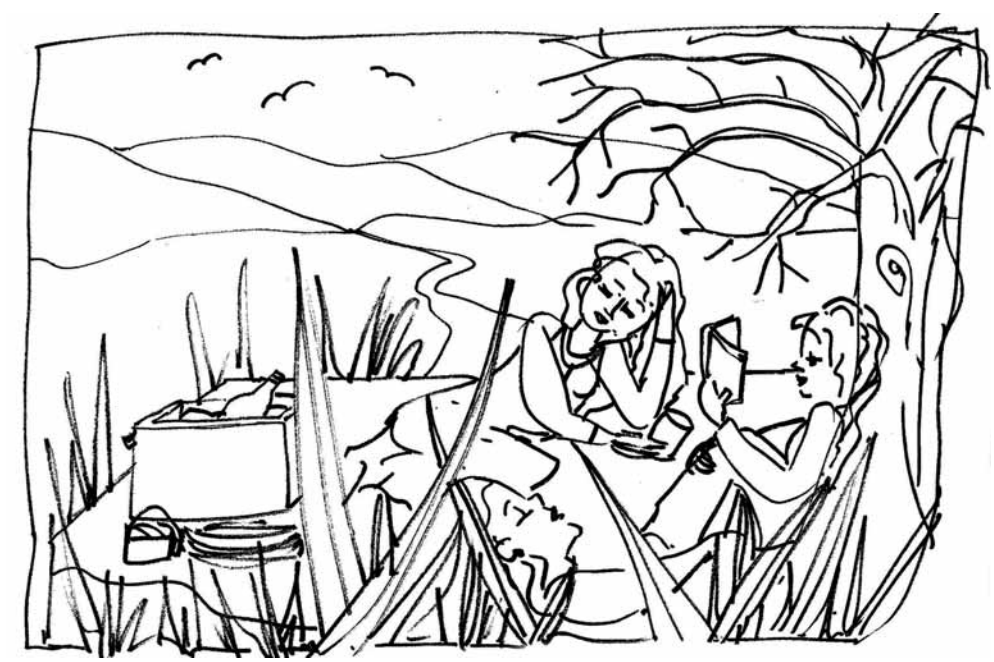

মহারাণী কথা

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

সাদা পোশাকের একটু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার হাওয়া লেগে থাকা আদ্যন্ত হিন্দু নারী জড়িয়ে থাকে সম্রাজ্ঞীর শরীরে মনে ছায়ার মত। হয়ত বা জেনে না জেনে সম্পূর্ণ রাজনগরের সর্বত্রই তাঁর অশরীরি উপস্থিতি। ফুটে ওঠে তাঁর ভাবনা কলেজ পড়ুয়া, স্কুলের ছাত্র ছাত্রীকে ঘিরে ঘিরে কিংবা দূর থেকে রাজনগরে শিক্ষানবিশী কিংবা অধ্যাপক হয়ে কাজে যোগ দিয়েই অনেকে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এ রাজবাড়ির ইতিহাস সন্ধানে, এখানেই তো জয় রাজনগরবাসীর। রাজকীয় প্রথার রুদালির নিষ্ঠুরতায় কেঁপে ওঠা মেয়ে সম্রাজ্ঞী মনে মনে প্রণাম করে সুনীতিকে। রাজীবের অসুস্থতা কেটে গেছে, দুর্বলতা থাকুক, তবু মেয়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী যে তিনি। সম্রাজ্ঞীর ভাবনায় কি নতুন সৃষ্টির বীজ....

লাইব্রেরি খোলা থাকতে থাকতেই বেরিয়ে যেতে হবে। বহুক্ষণ ওখানেই থাকব বুঝলে? কেউ খোঁজ করতে এলে বলে দিও কলেজ হয়ে আমিডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরিতেই আছি। সোহাগিনী এখনও শাশুড়ি ঠাকরুনের অভ্যাসে মুখে উচ্চারণ করেন, দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

* * * *

পঁচিশে বৈশাখের ভোর। সম্রাজ্ঞীর শিশুবেলা লেগে আছে গাছটায়। এবার ভীষণ রকম ফুল ফুটিয়েছে, হলুদ বুকে সাদা কাঠগোলাপে বিন্দুর মত লেগে থাকে রাতের বৃষ্টিকণা। খুব ভোর থেকেই বিশেষ সকাল বোঝা যায় এ মিত্র বাড়ীর প্রাঙ্গনে। পর পর চার পাঁচখানা উঠোন, ধার ঘেঁষে ঘাস এখনও ভেজা। রোদ উঠতে ঘন্টাখানেক বাকি। ঝড় জলে মাঝে মাঝে বৈশাখি রাতগুলো মার কোল ঘেঁষা সম্রাজ্ঞীর গন্ধ গন্ধ মন এই দাড়িঅলা ঋষি কবিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকে। কেমন সম্মোহিত হয়ে যায় শৈশব। তারপর কৈশোর কাল। দেয়ালে রাজকীয় মর্যাদায় কবিগুরুর জমিদারি ছবিখানা বাড়ির উঠোন লাগোয়া রাজীবের দাদা প্রমথ'র ঘরে রাখা থাকে।

পরিষ্কার করা হয় দুবেলা। সেইতো কাঠ গোলাপের ফুলে মালা গাঁথায় হাতেখড়ি, দুধ সাদা কষ বেয়ে দুহাত চটচটে হয়ে যায়। বড় ডালা ভরে ফুল কুড়োনোর সে স্বাদ যে কী, সম্রাজ্ঞীর মত আর কে জানে! বাবা নির্দেশ দিতে থাকে, রানি, ফুলগুলো নিয়ে বারান্দায় উঠে আয়, ছবিটা মাকে টুলের ওপর রাখতে বল। আর নতুন টেবিল ক্লথে টুল ঢেকে দিবি। চন্দন এরপর তোকেই বাঁটতে হবে কিন্তু! রাণী নেচে ওঠে। আহা, মে মাসের এই যে দিন...বাবাতে মেয়েতে যেন প্রবল সৌহার্দ্য। আজ রাজীব বারান্দায় চেয়ারে বসে বসে দেখে। সকালে স্নান সেরে নেওয়া রাণী ফুলগাছের অজস্র ডালের হলুদ বুকের কাঠগোলাপ কুড়িয়ে জড়ো করে সাত সকালেই রবীন্দ্রনাথকে সাজিয়ে ছুটবে কলেজ। ওখানেও রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্যোক্তার দলে সেই মেয়ে। রাজীবের কি মুগ্ধতা জাগে! এখন আর কারও বলতে হয় না... “রানি এভাবে সাজিয়ে তোল”। চারগুচ্ছির মালা ক্রমে বাড়তে থাকে। দুটো করে বানায় এখন। একটা যাবে কলেজে অন্যটা বাড়ির ছবিতে। ধূপের গন্ধে ভরে উঠুক সবটুকু। একটু পরই বাবাতে মেয়েতে গেয়ে উঠবে ‘তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই...”। আজ ও চোখের সামনে কাঠগোলাপের অমসৃণ শরীর ধূসর বার্ধক্যে লেখে সাদাটে রঙ। তবু ফুল ফুটছেই অহরহ। বকুলের গাছ ওর স্কুলে হয়ত এখনও আছে, কিন্তু কাঠগোলাপের ঝ’রে পড়া দেখেই কখন যেন সুর ওঠে, ‘ঝরকে ঝরিছে বকুল/আঁচল আকাশে হতেছে আকুল।” সম্রাজ্ঞী কল্পনায় নিজের সুতির শাড়ীর আঁচল দুহাতে বাঁচিয়ে রাখে ঝড় থেকে। একটু ছোট থেকেই এ ধ্যানীর মত গাছের মূল কাণ্ড ধরে ধরে কাঠবেড়ালি হয়ে যেত ও। আর পাতাদের কাছাকাছি, ফুলেদের কাছাকাছি পৌঁছে যেত। আরাম কেদারার মত মাথা হেলান দেওয়ার এক পোক্ত ডাল ছিল। যেখানে মনখারাপগুলো বিছিয়ে দিয়ে কখনও কখনও পাতার রাজ্যে ঘুমিয়েও পড়ত।

কবি রবীন্দ্রনাথ, গায়ক রবীন্দ্রনাথ, গীতিকার রবীন্দ্রনাথতো হাতের মধ্যে ধরেই আছে রাজীব। বংশপরম্পরায় গীতবিতানের বিশ্বভারতী সংস্করণ সম্রাজ্ঞীর হাতে। প্রতিদিন সন্ধেয় ডোয়ারকিন হারমোনিয়ামের উপর পাতার পর পাতা সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী/দুই পাড়ের এই কানাকানি চলতেই থাকত। আর তারপর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে এই মানুষটার প্রতি কৌতূহল বেড়েছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির প্রতিটি মানুষের বিপুলতা প্রাণ ছুঁয়ে গেছে, বাঙালীয়ানা, চেতনা, বিপ্লব, নারীবাদ উন্মেষ, শিক্ষা সবকিছুর মূল প্রাণ কেন্দ্র ঠাকুরবাড়ির উপর প্রবল টান এ মিত্র পরিবার ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল সম্রাজ্ঞী মানে রাণীর মধ্যে । হঠাৎই রাজীবকে একদিন প্রশ্ন করে রাণী, আচ্ছা বাবা, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সর্বত্র গেছেন, এমনকি অবিভক্ত বঙ্গের তখনকার উত্তরের নানা জেলায় জমিদারির কাজকর্ম দেখাশোনার সময়, শিলাইদহের পদ্মার বুকে বোটের দুলুনিতে কত লেখা লিখেছেন বল। ছিন্নপত্রের প্রতি ছত্রে, বিভিন্ন কবিতা, ডায়রি আর অসাধারণ সব ছোট গল্পের চৌহদ্দি জুড়ে অবিভক্ত বঙ্গের নদী, প্রকৃতি, এখানকার মানুষ,তাদের জীবনযাত্রা সব কী অপূর্ব।... উনি রাজনগরে, তোমার প্রাণের শহর কোচবিহারে তো কোনওদিন এসেছেন বলে শুনিনি, তুমিওতো বলোনি...! রাজীব মিত্র মৃদু হাসেন।... আরে, রাজনগরে না এলে কি হয়েছে, তাঁর প্রাণ ছুঁয়ে ছিল উত্তরবঙ্গের পাহাড়। আর দার্জিলিঙে কতবার এসেছেন জানিস? আর কার ডাকে এসেছেন বলতো! শুনলে অবাক হয়ে যাবি, আমাদের প্রিয় মহারাণীর আহ্বানে। আর জানিস তো রাজবাড়ির সঙ্গে তো কবিগুরুর আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল সুনীতি দেবীর কারণেই! রাজনগরের মাটিই গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বকবির দরবারে, সেটা কি কম? এবার সে হাঁ করা মেয়ে রাজীবের টুকরো গল্পে বিপুল কৌতূহলে বসে গিয়েছিল মহারাণী সুনীতি দেবীর সে সময়ের জীবনের অংশটুকু ছুঁয়ে চিনে নিতে।

কেশব কন্যা সুনীতিদেবীর বড় মেয়ে সুকৃতি সুন্দরীর সঙ্গে বিয়ে হয় ঠাকুরবাড়ির মেয়ে স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথ ঘোষালের বড় ছেলে জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের। এও এক ইতিহাস তৈরি করেছে। কারণ এই বিয়ের সূত্রেই ঠাকুর বাড়ীতে প্রথম অসবর্ণ বিবাহ সূচনা হল। রবীন্দ্রনাথের ন’দিদি স্বর্ণকুমারীর যখন বেয়ান সুনীতি দেবী, তখন রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিদেবীকে ‘বেয়ান’ সম্বোধন করলেন আর তাঁর সেজ বোন সুচারুদেবীও কবির ‘সেজো বেয়ান’ হয়ে উঠলেন।

১১

কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বাড়ির অনিচ্ছায়। অমতে। জ্যাঠামশাই হরিমোহন সেনের জন্যই নিজের বাড়ি থেকে তাঁকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। ঠিক তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতেই তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন। তখন সুনীতি দেবীর জন্মই হয়নি। ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসে সেই প্রথম কোনও অনাত্মীয় বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করেছে। তারপর ঘটনা এগিয়েছে তো কালচক্রে। কেশব কন্যা সুনীতিদেবীর বড় মেয়ে সুকৃতি সুন্দরীর সঙ্গে বিয়ে হয় ঠাকুরবাড়ির মেয়ে স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথ ঘোষালের বড় ছেলে জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের। এও এক ইতিহাস তৈরি করেছে। কারণ এই বিয়ের সূত্রেই ঠাকুর বাড়ীতে প্রথম অসবর্ণ বিবাহ সূচনা হল। রবীন্দ্রনাথের ন’দিদি স্বর্ণকুমারীর যখন বেয়ান সুনীতি দেবী, তখন রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিদেবীকে ‘বেয়ান’ সম্বোধন করলেন আর তাঁর সেজ বোন সুচারুদেবীও কবির ‘সেজো বেয়ান’ হয়ে উঠলেন। সম্রাজ্ঞী এসব ছবি বুকের ভিতর জলছবির মত দেখতে পায়, পড়তে পারে রাজবাড়ির ভেতরের মানুষদের চলাফেরা, অতীত হয়ে যাওয়া কবিগুরু ও সুনীতি দেবীর গল্প ছবি কাহিনী হয়ে নড়াচড়া করে উঠোনময়। গ্রীষ্মে আতপ্ত হয়, বৃষ্টি ভেজে, আবার শরৎকালীন ফুরফুরে রোদে আর মেঘ সান্নিধ্যে ভাসতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ পেরোতে পেরোতে সম্রাজ্ঞীর গল্প হয়ে ওঠে। নিজের গল্প যেন। শ্রদ্ধাবান সেই মানুষ কেশবচন্দ্র, যিনি প্রথম পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহনের আদর্শিত পথে মানুষ খুঁজতে চেয়েছেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী জগন্মোহিনী দেবী সে সময় ঠাকুরবাড়ির গৃহিণী আর মেয়েদের অত্যন্ত নিজের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক একই ভাবে সম্রাজ্ঞীও কখনও কেশবচন্দ্রের মেয়েদের সঙ্গে না দেখা সেই ঠাকুরবাড়ির বন্ধু হয়ে যায়। সুনীতি দেবীরা সে সময় নিবিড় বন্ধুতায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির। তাদের কথা পড়তে পড়তে এ যুগের রাণীও টান অনুভব করে। মহারাণী সুনীতি দেবী তাঁর প্রাণ প্রিয় অহরহ, একাত্ম অনুভবে।

ইতিহাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে এও খুঁজে পায় রানী সুনীতি দেবীর জন্মের দু’বছরের মধ্যে আদর্শগত মত বিভেদে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদ ঘটলেও সে রেশ কিন্তু কেশবচন্দ্রের কন্যাদের প্রভাবিত করেনি। সম্পর্কও বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়নি। মহারানী ইন্দিরা দেবীর ‘জীবন কথা’ হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে রাণীর চোখে পড়েছে “মনে আছে কর্তা দাদামশায় (দেবেন্দ্রনাথ) মাঘোৎসবে কুচবেহারের মহারানি (কেশব কন্যান) সুনীতিদেবীকে এক প্রকাণ্ড ফুটবলের মত মেঠাই উপঢৌকন পাঠাতেন।”

এ রাজনগরের রাজবাড়ি ইতিহাস তৈরি করবে না তো কোথায় খুঁজতে যাবে রাণী ইতিহাস! এ মাটিরই তো পুত্রী সে। রাজীবের ভালবাসার সিটি কোচবিহারকে যুগের পর যুগ বদলে যেতে দেখেও ইতিহাসে অবিচল প্রাণ বলেই হয়তো তার জীবনেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লেগে থাকবে রাজনগরের পবিত্র মাটি আর ধূলোয় ওড়া তোর্সা পাড়ের বৃত্তান্ত।

সুনীতি দেবীর জীবনী হাতে রোমাঞ্চিত সম্রাজ্ঞী ছবির পর ছবি আলোড়িত হতে দেখে। মহারাণী সুনীতি দেবী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে প্রায় তিন বছরের ছোট ছিলেন। অনেকবার কবিগুরুকে তিনি ভাইফোঁটাও দিয়েছেন। রাণী মনে মনে ভাবে, ধুস আমার জীবনে এমন একজন ভাই জুটল না এখনও যাকে ফোঁটা পরিয়েছি, পরম আয়ু কামনা করেছি বলে গর্বে দুলে দুলে উঠব। পরক্ষণেই মনে হয়, না না বাবা এসব ভাবি কেন! আমার বাড়ির ভাই ফোঁটারও বিরাট আসর, সে আর কম কি, প্রায় দশ বার জন শরিকি ভাইয়েরা লম্বা মাটির বারান্দায় বসে আছে, রাণী গাল ফুলিয়ে শঙ্খ বাজায় আর মা’র ভেজে দেওয়া লুচি বেগুন ভাজা পরিবেশন করে। ....আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ ও ঠিক এইরকম ভাইফোঁটার বিপুল রকমারি খাদ্যের আস্বাদ নিতেন! কে জানে, সুনীতি দেবী তাঁকে খাওয়াতে পেরেছিলেন কিনা! সেও তো ইতিহাস, বড় দুর্মূল্য সে ছবির ঘর। সে ‘কমল কুটীর’।

কবিগুরু নিজেও সুনীতিদেবীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা অনেকবার অনেক টুকরো রচনায় নিজেই বলে গেছেন। সেই ‘কমল কুটীরে’ আয়োজিত সুনীতিদেবীর মৃত্যুবার্ষিকীতে সভাপতির ভাষণটুকু পড়ে রাণী বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেছেন, “ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে হৃদয়ের দৌত্য অবরুদ্ধ হয় না, এই আশা মনে রেখে আজ এসেছি স্বর্গগতা সুনীতি মহারানীর উদ্দেশ্যে এইকথা জানাতে যে, আমাদের সম্বন্ধ ঐহিক সীমা অতিক্রম করে অক্ষুন্ন আছে। মহারাণীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধের

এক অংশ পৈতৃক, এক অংশ ব্যক্তিগত।"

সত্যি, রাণীর মনে হয়েছিল যে বাড়ীতে, যে জোড়াসাঁকোয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন, সুনীতিদেবীর মায়ের কাছে যে স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন, সেই মাতৃক্রোড়েই সুনীতিও লালিত হয়েছেন, যেখানে স্বামীগৃহে সুনীতিদেবী অধিশ্বরী, সেখানে অনেকদিন আলিপুরের বাড়িতে, কমল কুটীরে, দার্জিলিঙে কবিও আতিথ্য পেয়েছেন। 'কেশবচন্দ্র ও তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ' হাতে নিয়ে সেমিনার নিয়ে পাগল রাণী ছুটে রাজীবকে একখানা পৃষ্ঠা খুলে দেখায়, খুশি খুশি তার মুখ। মুদ্রিত পৃষ্ঠা খুলে নিজেই উচ্চারণ করে "সেইসকল আনন্দ হিল্লোলিত কলহাস্যকমুখর দিনগুলি তাঁর প্রসন্নমুখর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।" রবীন্দ্র মানস আর সৃষ্টিধারায় এই যে রাজনগরের মহারাণীর সূত্রটুকু জেনেই কীখুশী রাণী! রাজীবও তাকে কখনও নিরুৎসাহ করেন না, তাই মৃদু হেসে খুশিটুকু ভাগ করে নেন।

সুনীতি দেবীর মহারাণী জীবনের সবটুকুতো আর আনন্দে উচ্ছলতায় কাটেনি, জীবনে দুঃখের সময় ও শান্তির জন্য, সান্ত্বনার মধ্যেও কবিগুরুর স্মরণ নিয়েছেন সুনীতি মহারাণী। কবিগুরু সে সময়টুকুর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "আমাদের পরস্পর দেখা হওয়ার অবকাশ ঘটত না, কিন্তু আত্মীয়তার যোগসূত্র আত্মায় আত্মায় নিরবচ্ছিন্ন ছিল।" কতগুলো সম্পর্ক কিছু উষ্ণতা সৃষ্টির প্রাবল্যে তীব্র হয়ে ওঠে, স্বতস্ফূর্ততা জাগায়। সুনীতি দেবীর প্রভাব লক্ষ্য করে বিস্মিত রাণী এবারে রবীন্দ্রজয়ন্তীর সেমিনারের একটি বিষয়ই রেখেছিল—'রবীন্দ্র সৃষ্টিতে সুনীতি দেবীর প্রভাব'। দিয়ে তো দিল, এবার বইপত্র যোগান দাও। বক্তা রেডি কর। অধ্যাপক ডঃ ব্যানার্জি তো থাকবেনই। সঙ্গে ছাত্র সংসদের অতীশ সেন আর গিরিবালা চৌধুরীকে সেকেন্ড ইয়ার থেকে নির্বাচিত করে সেমিনার কমিটি। গিরিবালা কাল এসেছিল সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে রাজীবের কাছে। রাজীব ও রাজবাড়ি, মহারাণী, মহারাজা, তাঁদের ইতিহাস, রাজকার্য, শিকার কাহিনী, খেলাধুলা প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে কেমন আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়েন আজকাল। তবে সম্রাজ্ঞী যোগান দিয়েছে অনেকটাই। স্থানীয় ইতিহাসকার ডঃ সুকান্ত পাল, নিবিড়া দেব এঁদের লিখিত পত্রপত্রিকা অনেকগুলো যোগাড় করে অতীশকেও যেমন সাহায্য করেছে, গিরিবালাকেও। সুতরাং আজকের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান একটু আলাদা আর বিশিষ্ট হয়ে উঠবে এ বিশ্বাস রাখে সম্রাজ্ঞী। আলোচনাও মধুরতর হবে। সঙ্গে রবীন্দ্র সুর থাকবে যে।

ডুয়ার্স থেকে পৌঁছেছেন ডঃ অমর মুখার্জি, উনি কিছুদিন নর্থবেঙ্গল ইউনিভারসিটিতেও ছিলেন। এখন অবসর নিয়েছেন। ওনার বক্তব্যে মংপু, কার্শিয়াং, তিনধারিয়ায় রবীন্দ্র যোগাযোগ কীভাবে ঘটেছে সবই নিশ্চয়ই উঠে আসবে। সুন্দর আর নতুন সজ্জায় কলেজ হল সাজিয়ে তোলা হয়েছে, সম্রাজ্ঞীরা বিশ্বাস করে পঁচিশতো আর শুধুই ধূপের ধোঁয়া, ফুলের গন্ধ, আর চন্দনের পুজো নয়, রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব ওদের কাছে বিরাট পাহাড়ের মত। যিনি বুক দিয়ে আগলে আছেন বাঙালীকে, ভারতীয়ত্ব, আন্তর্জাতিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয় ওরা। জাতীয় জীবন পেরিয়ে কতদূর। রচনায়, সৃষ্টিতে বজ্রের মত শক্ত আঁটুনিতে গাঁথা তাঁর মর্মবাণী। সম্রাজ্ঞীর মত ওর বন্ধুরাও বলে, "জানিস, যে বাড়িতে একখানা গীতবিতান নেই, সঞ্চয়িতার পৃষ্ঠা উল্টোয় নি কেউ কখনও তাদের বাড়িকে আর মানুষগুলোকেও কেমন অদ্ভুত মনে হয়!" একথা বলছিল সেদিন পর্না। ও প্রথম ওর বাড়িতে গীতাঞ্জলি কিনে নিয়ে গিয়েছিল ওর মা'র জন্মদিনে। এত ভালোবাসেন ওর মা গান গাইতে, সেটাই কখনও করতে পারেন নি। সেই পর্নাই ফার্স্ট জেনারেশন মাকে গান শোনায় গীতবিতান থেকে, গানের লাইনগুলো পড়ে শোনায়। বুক ভরে রাণীর।

***

মঞ্চে এ মুহূর্তে সঞ্চালনার কাজ করতে করতে দু এক কলি গানও গেয়ে নিয়েছে সম্রাজ্ঞী। ঐ মহামানবের গানে ঐ মানুষের মুখই মনে পড়ে। রবীন্দ্র সৃষ্টিতে তাঁর ছোটগল্পগুলোর বিরাট গুরুত্ব। জীবনের ধারাবাহিকতার এক স্তরে তখন তিনি। অখ্যাত জনের নির্বাক মনের

আসলে দার্জিলিঙে সুনীতি দেবী রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানোর পর উনি ছোটগল্প শুনিয়েছিলেন। ভূতের গল্প শুনতে মহারাণী খুব ভালবাসতেন। ওদিকে রবীন্দ্রনাথও ভূতের গল্প শুনতে ও শোনাতে ভালবাসতেন। এখানে দুজনের অদ্ভুত যোগ ঘটে গিয়েছিল। আর মহারাণী সুনীতিদেবীকে শোনাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে গল্পগুলো লিখলেন তার স্থান সাহিত্যক্ষেত্রে অনেকটা জায়গা করে নিল। মহারাণীর অসীম আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে ভূতের গল্প বানিয়ে বলতেন। এভাবেই সুনীতি দেবীর সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতেই তৈরি করে ফেললেন, দুরাশা, মণিহারা, মাষ্টারমশাই। আসলে সুনীতি বিশ্বাসই করতেন না যে, রবীন্দ্রনাথ ভূত দেখেন নি।

কাছাকাছি চলে গেছেন, তাদের দীন, সাধারণ জীবন যাপনের কথা কিংবা প্রকৃতির সান্নিধ্যের ছবি আর কোথায় আছে এভাবে! অতীশের বক্তব্যে উঠে এসেছে অতিথি, শাস্তি, সমাপ্তির টুকরো বাক্যাংশ আর আলোচনা। এবার রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক জীবনের প্রতি আগ্রহ কিংবা রোমাঞ্চকর ভৌতিক বিষয়ক কথা কাহিনী হয়ে বেশ কিছু এসেছে। এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে এক ফাঁকে বন্ধু সম্রাজ্ঞীর প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানিয়ে নেয় অতীশ।

আসলে দার্জিলিঙে সুনীতি দেবী রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানোর পর উনি ছোটগল্প শুনিয়েছিলেন। ভূতের গল্প শুনতে মহারাণী খুব ভালবাসতেন। ওদিকে রবীন্দ্রনাথও ভূতের গল্প শুনতে ও শোনাতে ভালবাসতেন। এখানে দুজনের অদ্ভুত যোগ ঘটে গিয়েছিল। আর মহারাণী সুনীতিদেবীকে শোনাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে গল্পগুলো লিখলেন তার স্থান সাহিত্যক্ষেত্রে অনেকটা জায়গা করে নিল। মহারাণীর অসীম আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে ভূতের গল্প বানিয়ে বলতেন। এভাবেই সুনীতি দেবীর সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতেই তৈরি করে ফেললেন, দুরাশা, মণিহারা, মাষ্টারমশাই। আসলে সুনীতি বিশ্বাসই করতেন না যে, রবীন্দ্রনাথ ভূত দেখেন নি। রবি জীবনীর পৃষ্ঠা খুলে অতীশ আর গিরিবালাকে নিয়ে যখন বসেছিল রাণী, ঠিক তখনই জীবনীকার প্রশান্ত পালের কথাগুলো পড়ে নিয়েছিল। ওখানে এ তথ্য পাওয়াই যায় যে, ময়ূরভঞ্জের মহারানী, সুনীতির ছোটবোন সুচারুদেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ।

"১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুনীতি দেবী শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে যান। সেই রাজকীয় ভ্রমণের জন্য খরচ হয়েছিল ২০৪।।৬" অতীশের গলার স্বর হলঘরের পরিবেশ ছুঁয়ে গেছে ততক্ষণে। আলোচনায় আজ কবির জন্মদিনে মহারাণীর বিশেষ জায়গা করে নেওয়া ও আলোচনা অন্য মাত্রা পাওয়া, এতে অধ্যারপকরাই সবচেয়ে খুশি।

* * *

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গেও কবির প্রীতির সম্পর্ক ছিল, বন্ধুমনস্কতার কথা উঠে এসেছে ওদের আলোচনা থেকে।

একবার দেশীয় রাজকুমারদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশ্বকবির পরামর্শ চেয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ। কবি কিন্তু এ ব্যাপারে নৃপেন্দ্রনারায়ণের কথাই বলেছিলেন। আর দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাও হয়। সে সময় থেকে দুই রাজার মধ্যে গভীর বন্ধুত্বও হয়। সুনীতি দেবীর মত স্বাধীন চেতা ও সচেতনভাবে নারীকে পাদ প্রদীপের আলোয় নিয়ে এসে সহমর্মীর মত পাশে থেকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছেন পূর্ণ মনস্কতায়। রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডের পন্ট স্ট্রিটের বাড়িতে এক অনাড়ম্বর গোপন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাও করেছিলেন সুনীতি দেবী।

সম্রাজ্ঞীও এসব শুনতে শুনতে রাজবাড়ির বিরাট ঝাড়বাতির নীচে রাজার ব্যক্তিগত আলোচনা সভাকক্ষ যেন দেখতে পাচ্ছিল। সেখানে সিংহাসনের মত চেয়ারে বসে আছেন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ, যিনি পূর্বপুরুষদের মত কখনই বহু বিবাহে বিশ্বাস করেন নি। কয়েকপুরুষ ধরে বহুবিবাহ চলে আসা রাজ পরিবারে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বহু বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি সহ্য করেও কঠিন দৃঢ়তায় তা রদ করে দিয়েছিলেন। মহারাজের এই অসম্মতির পিছনে সম্রাজ্ঞী মধুর এক প্রেমের ছবি খোঁজে, আর সুনীতি দেবীর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও ভালবাসা দুইই দৃঢ় হয়ে যায়।

সম্রাজ্ঞীর বুকের ভেতর গোপন কাঁটা হঠাৎ প্রবল নড়ে ওঠে। আসলে ভালবাসা কথাটার মধ্যে যন্ত্রণা যে পাশাপাশি।

* * *

অনেকগুলো মুখ সে সূত্র ধরে রাণীর মাথার ভিতর, অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে। কবির গান উঠছে তখন মঞ্চে...আকাশ আমার ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে...

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

স্কেচ দেবাশিস সাহা

ধারাবাহিক কাহিনি

অরণ্য মিত্র

লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর

রবির প্রাপ্য টাকা পৌঁছে দিতে গিয়ে কিছু কিছু তথ্য জানলেন নন্দন বর্মা। কিন্তু খুনের কোনও সদুত্তর নেই। সন্দীপ মাস্টারকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে মেয়ের অনীহা দেখে পরেশ প্রামাণিক বিরক্ত। এর মধ্যে মনোজ গেল মাস্টারের ভাড়া ঘরে। তাঁকে এক বোতল দামি হুইস্কি দিয়ে দিলেন সন্দীপ জানা, হয়ত রিয়াকে স্মরণ করেই। দর্শনের অধ্যাপক নন্দন বর্মা একদিন নিজের ঘরে বসে কাগজে লিখতে থাকেন তাঁর অনুমান। শেষ পয়েন্টে লেখেন 'রবি শিঙ্গিহাটায় যায় নি'। শালগুড়ি নামক সাধারণ এক গ্রামের দৈনন্দিন আবহাওয়ায় রবি রহস্যের কি কিনারা মিলবে?

১৭

ভৃগু জ্যোতিষ ভোর চারটেয় ওঠেন। স্নান করে ঘন্টাখানেক ঠাকুর ঘরে কাটিয়ে পুজোর প্রসাদ খেয়ে মর্নিং ওয়াকে বের হন সকাল ছটা নাগাদ। পসার তাঁর মন্দ নয়। কাস্টমারকে ভাগ্যের সঙ্গে যুঝবার পরামর্শ দিয়ে ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে নিশিপ্রসাদ সেন ওরফে ভৃগুশ্রেষ্ঠ ফালাকাটা শহরে দু কাঠা জমি কিনে দোতলা বাড়ি করেছেন। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কলকাতার এক মাঝারি মাপের সোনা ব্যবসায়ির ছেলের সঙ্গে। বছর দুয়েক আগেও শিলিগুড়ি সমেতে ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটা শহর এমন কি আসামেও ঘুরে ঘুরে চেম্বার করতেন। তারপর গুরুতর অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে এক সপ্তাহ ভর্তি থাকার পর ডাক্তারের নির্দেশে বাইরে কাস্টমার মিট করা ছেড়ে দিয়েছেন একেবারে।

পৌষ মাসের ঠান্ডা বেশ জমিয়ে পড়তে শুরু করেছে ক-দিন হল। মাথার টুপি যথা সম্ভব টেনে নামিয়ে ভৃগুবাবু হাঁটা শুরু করলেন। সামনের রাস্তায় কোচবিহার মুখি স্টেট বাস গুড়গুড় করছে। কন্ডাক্টর তাঁকে দেখে হাত নাড়ল। দিন পনের আগে কন্ডাক্টরকে বেলজিয়াম পান্না দিয়েছিলেন ভৃগুবাবু। একাগ্রতা ফেরাবার জন্য।

ফোনটা তখন বাজল।

এত সকালে কাস্টমার ফোন করে না। বাড়ির ফোন ভেবে ভৃগুবাবু মোবাইলটা পকেট থেকে বের করে দেখলেন 'রিয়া'। তাঁর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। ভাল কাস্টমার। বাড়িসুদ্ধু তাঁকে বেশ মানে। একটা বিশেষ সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার পর রিয়া আরও বেশি করে মানতে শুরু করেছে তাঁকে। সম্প্রতি একটা ভাল গোমেদ এসেছে ভৃগুবাবুর হাতে। ফোন রিসিভ করতে করতে ভাবলেন, গোমেদটা রিয়াকে ধরাতে হবে।

'কী ব্যাপার? এত সকালে?'

'আপনি ভোর চারটেয় ওঠেন জানি। মর্নিং ওয়াকে?'

'এই বের হলাম। বলো। সব ঠিক তো?'

'চলছে।'

'সেই ছেলেটার মার্ডারের কোনো সুরাহা হলো?'

'নাঃ!'

'মনোজ এসছিল এর মধ্যে। বলেছে তোমাকে?'

'না তো!'

'সে অবশ্য ঠিক আমার কাছে আসে নি। ফালাকাটায় এসেছিল পার্টির কাজে। আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে।'

'হ্যাঁ। ফালাকাটায় মিটিঙে গেছিল একদিন।'

'মনোজ বলল সে ছেলেটার ফোন রেকর্ড থেকে জানা গেছে সে নাকি সেদিন তোমাদের বাড়িতে প্রায় ঘন্টাখানেক ছিল?'

'এটা বলেছে আমাকে। হতে পারে। অনেক সময় পেছনের নদী থেকে স্নান করে দোকানে ফিরত। আপনি তো জানেন আমাদের বাড়িটা সামনে পেছনে কতটা জায়গা।'

'তোমার এবার একটা গোমেদ নেওয়া দরকার মা!' ভৃগু জ্যোতিষ নরম গলায় বললেন। 'হাজার হলেও ছেলেটা তোমাদের কর্মচারি ছিল। অপঘাতে মৃত্যু। একটা এফেক্ট তো থেকেই যায়।'

'পাঠিয়ে দিন না। কত পড়বে? বাবাকে বলে রাখব'খন।'

'আরে টাকা পয়সার কথা পরে হবে।' ভৃগুবাবু অমায়িক হাসলেন। 'পর পর তোমাদের যাচ্ছে কেমন, ভাবো! প্রথমে তো সেই ব্যাপারটা। আমি না থাকলে সেটা নিয়ে যে কী বিপত্তি ঘটত, ভাবতে পারছ? সেটা মিটতে না মিটতেই একটা খুন। আসলে তোমাদের পুরো ফ্যামিলিটা এখন বেস্পতির ছায়ায় আছে। বেস্পতির গ্রহণ লেগেছে। ফাল্গুন মাসে একটা যজ্ঞ কর তো! আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

'আপনার ওপর সবারই খুব ভরসা।'

'তা এত সকালে ফোন করলে কেন বলো।'

'ক-দিন ধরে মনটা খুব অস্থির হয়ে আছে। ভয় ভয় লাগছে।'

ভৃগু জ্যোতিষ চারদিক একবার দেখে নিলেন। ফাঁকা গলিপথে এই মুহূর্তে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আকাশ কুয়াশায় ঢাকা। সূর্য প্রায় অদৃশ্য। রাস্তার কোনায় দাঁড়িয়ে পড়ে তিনি নিচু গলায় বললেন, 'দেখ মা! তুমি হলে আমাদের শাস্ত্রমতে নাগিনী কন্যা। তোমরা যা ধরো, একেবারে জাপ্টে ধরো। ছাড়তে চাও না। এসব ব্যাপারে গোমেদ খুব ভালো। সোনার ওপর পরবে। লকেট করে সোনার হারেও পরতে পারো। ভয় ভয় ভাব আর অস্থিরতা নিয়ে ভেব না। ভয় লাগছে কেন বুঝতে পারছ?'

'হয় তো পারছি ---।'

ভৃগু জ্যোতিষ অভিজ্ঞ মানুষ। ফোনের মধ্যে তিনি রিয়ার গলার সামান্য কাঁপন ধরে ফেললেন। বুঝতে পারলেন রিয়ার কথা আটকে গেল। তিনি মধুর স্বরে অভয় দিয়ে বললেন, 'কিছু লুকিও না মা। আমাকে না বললে কাকে বলবে?'

'সব কিছু আমাদের বাড়িতেই ঘটেছে! আমি সব জানি জেঠু! আমার ভয় লাগছে!'

ভৃগু জ্যোতিষ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'ভয় পেও না মা! আমি কাল যাচ্ছি তোমার ওখানে। ফোনে এখন আর কিছু বলো না।'

১৮

সকালের মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছিলেন নন্দন বর্মা। গেটের সামনে পুলিশের জিপ থামতে দেখে কৌতূহল বোধ করলেন। জিপে একাধিক পুলিশ থাকলেও নামলেন মাত্র একজন। কাঁধের তারা দেখে নন্দন বর্মা অনুমান করলেন সে সম্ভবত আইসি। বয়স বেশি নয়। হাসিমুখে টুপি বগলে নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'চিনতে পারছেন স্যার? আপনার ছাত্র ছিলাম। পাস কোর্সে ফিলজফি ছিল। সেবার ব্যাচে আমি একাই ছিলাম ছেলে।'

নন্দন বর্মা একটু একটু মনে করতে পারলেন। স্মিত হেসে বললেন, 'বাগচি টাইটেল ছিল তোমার। নামটা মনে নেই।'

'পলাশ।' প্রণাম করে বললেন পলাশ বাগচি। 'ময়নাগুড়ির দায়িত্বে আছি। এদিকে একটা তদন্তে এসেছিলাম। ফালতু কেস। ভাবলাম দেখা করে যাই।'

'বোসো। চা খেয়ে যাও। নাকি তাড়া আছে?'

'তাড়া ভাবলে তাড়া স্যার। কিন্তু চা কে বানাবে? আপনার ফ্যামিলি তো শুনেছি এখানে থাকে না।'

'এটাও জান?'

'পুলিশ তো স্যার! জেনে যাই।'

'কাজের লোক আছে। চা ফ্লাস্কে পাওয়া যাবে খানিকটা।'

'আনুন স্যার।'

ভেতরে গিয়ে দু-কাপ চা নিয়ে এসে নন্দন বর্মা পলাশ বাগচির মুখোমুখি বসলেন।

'তুমি তো লজিকে বেশ ভালো ছিলে। এখন মনে পড়ছে।'

'ফিলজফি পড়াটা বেশ কাজে লাগে স্যার।' পলাশ বাগচি হাসলেন। 'সেন্স অফ লজিকটা ধারাল হয়। পুলিশ বিদ্যায় এটা খুব কাজে লাগছে।'

নন্দন বর্মা খুশি হলেন। লেখাপড়া নিয়ে পাব্লিকের আদিখ্যেতার শেষ নেই। অথচ ফিলজফিকে ভাবে মেয়েদের সাব্জেক্ট। তিনি নিজে অধ্যাপনার জীবনে খুব কম ছেলেকে দর্শন পড়তে দেখেছেন।

'আপনাদের এদিকে স্যার একটা মিস্টিরিয়াস মার্ডার হয়েছিল। জানেন নিশ্চই?'

'রবির কথা বলছ তো? জানি। তা এ ব্যাপারে তোমরা কি ফেলিওর?'

'কেসটা পিকিউলিয়ার স্যার।' লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বললেন পলাশ বাগচি। 'মার্ডার কেসে পুলিশ জেনারেলি কম্প্রোমাইজ করে না। এই কেসটাতে কোনো প্রেশারও ছিল না। কিন্তু পুরোটাই এখনো অন্ধকারে।'

'ওই বাড়িতে আমাদের একটা খোচর নজর রাখে। যদি কিছু ক্লু আসে।' 'মানতে হবে তোমরা সাঙ্ঘাতিক!' হাসতে হাসতে বললেন নন্দন বর্মা। পলাশ বাগচিও হাসলেন খুব। তারপর হাসি থামিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় ওই বাড়িরই লোক কেউ জড়িত গোটা ব্যাপারটায়। কিন্তু কোনো মোটিভ পাচ্ছি না। ওই রকম একটা খুন করার জন্য যথেষ্ট কারণ লাগে স্যার। তার ওপর মোবাইল লোকেশান বলছে ছেলেটা ফাইনালি সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য জায়গায় গেছে।'

'রবির খোঁজখবর করেছিলে নিশ্চই?'

'ওর পাস্ট যেটুকু জানা গেছে মোটামুটি নর্মাল। মোটিভ কিছু আন্দাজ করতে পারি নি। আমার মনে হয় স্যার এটা সুপারি দিয়ে মার্ডার নয়। ছেলেটা ওর মালিকের বাড়িতে ঘন্টাখানেক ছিল। মোবাইল লোকেশান তাই বলছে। কিন্তু মনোজবাবুর ওয়াইফ বলছেন সেটা তাঁদের জানা ছিল না। হয়তো বাড়ির পেছন দিকে ছিল। নদীতে স্নানও করতে যেতে পারে। একটা মেয়ে আছে, নামটা স্যার ভুলে গেছি, মনোজবাবুদের রিলেটিভ। পাশের বাড়িতেই থাকে। সেও সেদিন মনোজবাবুর ওয়াইফের সঙ্গে টিভি দেখছিল। তাঁর বক্তব্যও এক।'

'বক্তব্যটা কী?'

'ঘিয়ের টিন নিয়ে ছেলেটার দোকানে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু এক ঘন্টা পরে যে বেরিয়েছে, সেটা জানত না। অবশ্যি মনোজবাবুদের বাড়িটা সামনে পেছনে মিলিয়ে অনেকটা জমির ওপর। পেছনে চায়ের বাগানও আছে। আমার অনুমান ওই বাড়িতে কিছু একটা হয়েছিল যেটা বাড়ির কেউ জানে না।'

'রবি ছেলেটার মধ্যে নাকি একটু লেডি কিলার ব্যাপার ছিল। এখানেও একটা প্রেম প্রেম ব্যাপার হয়েছিল শুনেছি।'

'পরেশ প্রামাণিকের মেয়ের সঙ্গে একটু ভাব ভালোবাসা ছিল। পরেশবাবু অবশ্যি ঘোড়েল লোক স্যার। হিস্ট্রি ভালো নয়। তবে মার্ডার ও করে নি। গল্প অন্য কিছু আছে। হতে পারে মনোজবাবুর বাড়ির পেছনে কেউ ছোকরাটার সঙ্গে মিট করেছিল। সে মাল আনতে মালিকের বাড়ি দুপুরের দিকে গেলে পেছনের বাগানের দিকে মাঝে মাঝেই যেত। এটা আপনার বন্ধু জানত। তাঁর বাড়ির লোকেরাও জানত। কিন্তু এ নিয়ে কিছু ভাবে নি।'

'রাধু যে আমার বন্ধু সেটাও জান?'

'ইয়েস স্যার।' চায়ের কাপ নামিয়ে মোলায়েম হাসল পলাশ বাগচি। 'এটাই জানি যে আপনার দু-জন মাথাভাঙ্গা গেছিলেন। ওই ছোকরার বাড়ি।'

'এটা কী করে জানলে?' নন্দন বর্মা বিস্মিত হতে গিয়ে হেসে ফেললেন।

'ওই বাড়িতে আমাদের একটা খোচর নজর রাখে। যদি কিছু ক্লু আসে।'

'মানতে হবে তোমরা সাঙ্ঘাতিক!'

হাসতে হাসতে বললেন নন্দন বর্মা। পলাশ বাগচিও হাসলেন খুব। তারপর হাসি থামিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় ওই বাড়িরই লোক কেউ জড়িত গোটা ব্যাপারটায়। কিন্তু কোনো মোটিভ পাচ্ছি না। ওই রকম একটা খুন করার জন্য যথেষ্ট কারণ লাগে স্যার। তার ওপর মোবাইল লোকেশান বলছে ছেলেটা ফাইনালি সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য জায়গায় গেছে।'

নন্দন বর্মা অন্যমনস্ক সুরে বললেন, 'হুঁ।'

১৯

কনকনে শীত। রিয়া বিছানায় বসে গায়ে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে মুখে ক্রিম মাখছিল। পাশে লেপের ভেতরে শুয়ে মনোজ দেখছিল সেটা। কয়েকদিন ধরেই রিয়াকে অন্যরকম দেখছে সে। গত সাতদিন একবারের জন্যও মিলিত হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে নি সে। ইদানিং মনোজ এক কবিরাজের পরামর্শে 'বারুদ ক্যাপসুল' খাচ্ছে রাতে শোয়ার আগে হালকা গরম দুধের সঙ্গে। গত দু-দিন হলো ক্যাপসুল ফর্মা দেখাতে শুরু করেছে। রিয়ার ক্রিম মাখা দেখতে দেখতে পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। গত দু-দিনও হয়েছিল। শেষে উত্থিত অঙ্গ নিয়েই ঘুমিয়ে পড়তে হয়েছে মনোজকে। আজও যদি কিছু না হয় তবে বাথরুমে গিয়ে হস্তমৈথুন করতেই হবে।

রিয়া ক্রিম মাখা শেষ করে মনোজের দিকে তাকাল। মনোজ হাসিমুখে বলল, 'গন্ধটা বেশ।'

রিয়া জবাবে যেন কষ্ট করে হাসল মাত্র।

'তোমার কি শরীর টরির খারাপ নাকি?'

রিয়া না তাকিয়ে অন্যমনস্কের সুরে জানাল শরীর ঠিক আছে।

'আমি একটা ওষুধ খাচ্ছি ক-দিন হলো।'

'দেখেছি। টেবিলেই তো থাকে।'

'সে ওষুধের বড়ো জ্বালা। কবিরাজ কসে পারিলে

বউই পারিম্ দূর করিতে জ্বালা !'

রিয়া ম্লান হাসল। মনোজের দিকে ফিরে বলল, 'রবি সেদিন এই বাড়িত্ অনেকক্ষণ সিলো। এইখানে কিসু হয় নাই তো?'

'বুজসি!' চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা মনোজ রিয়ার দিকে ফিরল। 'ময়নাগুড়ির আইসি কসে মোক। পসিবিলিটি আসে। কিসু হৈতেও পারে। কিন্তু এইটাও কাথা যে রবি ফাইনালি শিঙ্গিহাটায় গেইল।'

'মোক ভয় নাগে।'

রিয়ার মুখে হালকা ভয়ের ছাপ। মনোজ সেই মুখ দেখে ক্যাপসুলের কার্যকারিতা প্রবল ভাবে টের পেল মনোজ। হাত বাড়িয়ে রিয়ার থুতনি ধরে বলল, 'এইটাই তর ভয়? মুই আছ কোন কামে? এইটা কুনো প্রবলেমই না। রবিরে স্যালা ভূতে মারিসে।'

কথা শেষ করেই থুতনি ছেড়ে হাতটা আরেকটু বাড়িয়ে রিয়ার ঘাড় ধরল। তারপর হ্যাঁচকা টানে এনে ফেলল তাঁকে নিজের ওপর।

'ক্যাপসুলের পাওয়ার টেস্ট করিম্ মুই।'

রিয়া শরীরটাকে একটু উঠিয়ে নিজেকে চাদরমুক্ত করল। তারপর মনোজের ওপর থেকে লেপটা একটানে হাঁটু পর্যন্ত সরিয়ে দিয়ে একটু হেসে বলল, 'পাওয়ার তো মুই দেখিসু। কিন্তু খুব টেনশনে ভুগিসু মুই।'

'টেনশনে সেক্স করতে হয়।' বউকে নিজের ওপর টেনে এনে ঘরঘরে গলায় বলল মনোজ। 'সেক্সি নাইটি পিন্ধিয়া চুপচাপ বগলৎ নিদ গেইলে চলবে? ভয় ত পাবিই!'

'কী করিম্?'

'খুল্!'

রিয়া বিনাবাক্যে নিজেকে নাইটির আড়াল থেকে বাইরে লেপটাকে টেনে নিল। মনোজের বুকের ওপর উপুর হয়ে ফিসফিস করে বলল, 'বারুদ ক্যাপসুল। মুই জানঅ। কাইন্ড অফ ভায়াগ্রা।'

'তোদেরও আসে। কাল আনিম্।'

'মোক না নাগে। আজ তুই নিচৎ থাক!'

ভিতু রিয়া আচমকা দুঃসাহসী বাঘিনী হয়ে গেল। বারুদ ক্যাপসুল জিন্দাবাদ! মনোজের মনে হলো সে নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাবে। তাঁর কোমরের অংশ পুরোটাই ঢুকে যাবে রিয়ার ভেতর। সে সর্বশক্তি দিয়ে রিয়াকে দু-হাতে জাপটে উচ্চারণ করতে লাগল 'ওঁক! ওঁক!'

এক সময় বারুদ ক্যাপসুলে আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটল। হাঁফাতে হাঁফাতে নেতিয়ে পড়ল মনোজ। টের পেল দুটো নগ্ন শরীর এই শীতেও ঘামে সপসপ করছে। অপূর্ব আবেশ ভাসতে ভাসতে সে এক সময় শুনল বুকের ওপর এলিয়ে পরা রিয়া বলছে, 'সন্দীপ মাস্টারের সঙ্গে পরেশবাবু ওর মেয়ের বিয়ে দেবে।'

'কে কইল্?'

'ওর মেয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। ফেসবুকে। আমার এডভাইস চাইছিল।'

'তুই কী কইসিস্?'

'শুরুতে না বলেছিলাম। আজ বললাম রাজি হয়ে যেতে।'

'ভাল্ করসিস। পরেশ স্যালা একটা কল্‌খোয়া পাব্লিক। তবে মেয়েটা ভাল্।' মনোজ তৃপ্ত গলায় বলে। তারপর রিয়ার মাথাটা দু-হাতে তুলে নিয়ে লঘু সুরে বলে, 'সন্দীপ মাস্টর তর প্রেমে পরিসে!'

'ধেৎ!' রিয়া হেসে ফেলল।

'ধেৎ কী? তুই ত স্যালা শালগুড়ির রানি।'

'তুই তবে রাজা!'

'তবে রাজার ট্যাক্স দে!'

মনোজ আবার পূর্ণোদ্যম নিয়ে ময়দানে নামল। বারুদ ক্যাপসুলের মহিমা সত্যিই অপার! রিয়া দলিত হতে হতে শীৎকারের ফাঁকে ফাঁকে বলল, 'মুইও খাম্ ক্যাপসুল। আনি দিস ---।'

২০

জানুয়ারির গোড়ায় স্কুল তেমন জমেনি। সামনেই স্পোর্টস। গেম টিচারের অনুরোধে সন্দীপ জানা লং জাম্পের দায়িত্ব নিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের প্র্যাকটিশের ছবি ফেসবুকে দিয়ে প্রচুর লাইক পাচ্ছেন দেখে উৎসাহ নিয়েই স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সব গোলমাল করে দিল একটা এসেমেস। রিয়া লিখেছেন, 'অনেক দিন আসেন না। ক্যামেরা খারাপ নাকি? আজ আসবেন সাড়ে এগারটার দিকে?'

বার্তা পেয়ে মিনিট দশেক অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর সন্দীপ জানা লিখলেন, 'ক্যামেরা নিয়েই যাচ্ছি।'

আসলে দিন পনের হলো ফেসবুকে একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সন্দীপ জানার। তাঁর নাম 'নির্জন বনানী'। প্রোফাইলে একটা বাচ্চা মেয়ের হাসিমুখ। সন্দীপ জানা গোড়ায় ভেবেছিলেন ফেক আইডি। পরে বুঝলেন নির্জন বনানী সত্যিই একজন মেয়ে। এরপর মেয়েটির প্রতি বেস আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করলেন তিনি। মেয়েটার আর কোনও পরিচয় জানা যায় নি। কিন্তু সন্দীপ জানার প্রবল সন্দেহ সে কাছেপিঠেই

রিয়া বাইরের উঠোনে মোড়ায় বসে মোবাইল ঘাঁটছিল। পাশে আরেকটা মোড়া। সন্দীপ জানা বাইক দাঁড় করিয়ে কাঁধে ঝোলান ক্যামেরার ব্যাগ ঠিকঠাক করতে করতে বললেন, 'এখানেই বসব?' 'ঘরে বসবেন? ঘরটা খুব ঠান্ডা।' রিয়া হাসিমুখে জানাল। 'খুব ব্যস্ততা যাচ্ছে নাকি?'

'না না।' সন্দীপ জানা বসলেন। 'আজ আপনার মেসেজ পেয়ে ভাবলাম সিএল নিয়ে নিই।

থাকে। তাঁর স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রীও হতে পারে এবং তাঁকে বেশ চেনে।

অতি সম্প্রতি নির্জন বনানীর পরামর্শে সন্দীপ জানার অভ্যাসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল এসেছে। তিনি এখন নিয়মিত দাড়ি কাটছেন। ইস্তিরি করা প্যান্ট শার্ট পরছেন। পারফিউমও মাখা শুরু করেছেন। এবার দরকার একটা লেদার জ্যাকেট।

কিন্তু আপাতত রিয়ার বার্তা তাঁকে সাময়িক ভাবে বনানীর উত্তেজনা ভুলিয়ে দিল।

রিয়া বাইরের উঠোনে মোড়ায় বসে মোবাইল ঘাঁটছিল। পাশে আরেকটা মোড়া। সন্দীপ জানা বাইক দাঁড় করিয়ে কাঁধে ঝোলান ক্যামেরার ব্যাগ ঠিকঠাক করতে করতে বললেন, 'এখানেই বসব?'

'ঘরে বসবেন? ঘরটা খুব ঠান্ডা।' রিয়া হাসিমুখে জানাল। 'খুব ব্যস্ততা যাচ্ছে নাকি?'

'না না।' সন্দীপ জানা বসলেন। 'আজ আপনার মেসেজ পেয়ে ভাবলাম সিএল নিয়ে নিই। ফোটোও তোলা হচ্ছে না অনেক দিন!'

'তা হলে ফেসবুকে যে সব পোস্ট করছেন, সেগুলো আপনার তোলা নয়?'

'না না। আমারই তোলা। আসলে নেচারে গিয়ে ফোটো তোলা হচ্ছে অনেক দিন।'

'আমার তো মনে হয় ব্যস্ততার কারণ অন্য।' রিয়া যেন গম্ভীর হল। মোবাইল স্ক্রিনে আঙুল বুলিয়ে সময় কাটাল একটু। সন্দীপ জানা কিঞ্চিৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা অনুভব করলেন।

একটু পরে রিয়া মোবাইল থেকে চোখ তুলে সরাসরি তাকাল সন্দীপ জানার চোখের দিকে।

'বনানীকে ভালো লাগছে?'

'ব ---।' একটাই অক্ষর বের হল হতভম্ব সন্দীপ জানার মুখ থেকে। রিয়া আচমকা হেসে যেন গড়িয়ে পড়ল এরপর।

'নির্জন বনানীকে আমি চিনি সন্দীপবাবু! ভালো মেয়ে। দেখতেও বেশ।'

'সে তো ফেসবুকে অনেকেই ---।'

'থামুন তো!' রিয়া প্রায় ধমকে ওঠে। 'আমি পারফিউমের গন্ধ ভালোই পাচ্ছি। এসব আপনি আগে মাখতেন? লেদার জ্যাকেট কদ্দুর?'

'আপনাকে এসব বলেছে?'

'রাগ করলেন?'

'না না! আচ্ছা --- মেয়েটি কে বলুন তো?'

'প্রেম করবেন?'

'লোকাল?'

'আপনার কি চালানি পছন্দ?'

সন্দীপ জানা বলার কিছু খুঁজে পেলেন না। রিয়া মিটিমিটি হাসছিল। হঠাৎ সাহস এলো সন্দীপ জানার মনে। রিয়াকে হঠাৎ মনে হল বন্ধু। তিনি ছদ্মরাগের সুরে বললেন, 'আমাকে প্রেমে পড়ার প্ল্যান করেছেন আপনি, তাই না?'

'প্ল্যানটা মেয়ের বাবার। আমি কিন্তু নির্জন বনানীকে বলে আসছিলাম বিয়ের কথা না ভেবে ক্যারিয়ার গড়তে। পরে মত বদলেছি।'

'কেন?'

'আপনি লোকটা খারাপ নন। আপনাকে শালগুড়ির জামাই হিসেবে ভাবা যায়।'

'আমি রাজি হব কী করে ভাবলেন?'

রিয়া একটু চুপ করে থাকল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'আপনার একজন নারী দরকার এটা বুঝেছিলাম। বাকিটা ফিফটি ফিফটি। আপনি রাজি না হতেও পারতেন। কিন্তু—।'

'কিন্তু?'

'আপনি দাড়ি কাটছেন এবং পারফিউম ব্যবহার করছেন। আর আপনার দেওয়া স্কচটা বেশ ভালো ছিল।'

এইবার সন্দীপ জানা না হেসে পারলেন না। সে হাসির মধ্যে একটু লজ্জাও মিশেছিল। রিয়া সেই হাসিটা লক্ষ্য করে নিশ্চিত হল যে সন্দীপ জানা প্রেমে পড়েছে।

ঘন্টা খানেক নির্জন বনানী বিষয়ে যাবতীয় তথ্য জেনে নিয়ে সন্দীপ জানা সিদ্ধান্তে আসলেন, রবি একটি খারাপ ছেলে। তারপর অনেকগুলো ছবি তুললেন রিয়ার। এই প্রথম রিয়ার লাস্য-কটাক্ষ উপেক্ষা করে পুরোপুরি ক্যামেরায় মন দিতে পারলেন সন্দীপ জানা। রিয়ারও মনে হলো, সে একজন পেশাদার ফোটোগ্রাফারের লেন্সের সামনে দাঁড়িয়ে।

সুতরাং ফোটোগুলো অসাধারণ হল।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

কোচবিহার থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল ২০১৮

উৎসব উদ্বোধন

বালুরঘাট শপথ

কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ

জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম

কলকাতা অনীক

রাসমেলা শেষ হতেই নাট্যোৎসবের ঘন্টা বাজিয়ে দিল কোচবিহার থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল। ১২ থেকে ১৬ ডিসেম্বর কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে এই উৎসবের আয়োজক ছিলেন (মধ্য) কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ। পাঁচ দিনে দশটি নাটক — শুভ সূচনা হল নতুন প্রজন্মের হাতে — কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের রাজ্যস্তরে পুরস্কার বিজয়ী প্রযোজনা 'ন্যায় ধর্মীর রামায়ণী পালা' দিয়ে। প্রথম দিনই ছিলেন কলকাতার পুরনো নাট্য গোষ্ঠী 'অনীক' উৎপল দত্তের নাটক 'লৌহমানব' নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্তালিনের ভূমিকা নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে তাই ছিল নাটকের বিষয়, ইতিহাসকে যে মাঝে মাঝে ফিরে দেখতেই হয়!

আমন্ত্রিত নাট্য দলের মধ্যে সিউড়ির 'আনন' প্রযোজিত 'স্বপ্নস্নান'-এ বেজে ওঠে সাবেক শাশ্বত সুর — প্রকৃত তীর্থ রয়েছে আশপাশের মানুষ জীব প্রকৃতির মধ্যেই। শিলিগুড়ির 'দামামা' প্রযোজিত মুন্সী প্রেমচন্দের 'আখরি ইনাম' সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শৈল্পিক জেহাদ। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'র মূক প্রযোজনায় সফল জলপাইগুড়ির 'সৃষ্টি মাইম থিয়েটার'। বালুরঘাট 'শপথ'-এর 'তিমির বিনাশী' এক প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্বের স্মৃতি থেকে উঠে আসা নানান নাটকের চমৎকার কোলাজ।

আয়োজক কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ-এর ছিল দুটি নাটক, একটি মহাশ্বেতা দেবীর গল্প অবলম্বনে 'বাস্তুসাপ' পূর্বাচলবাবুর নির্দেশনায়, অপরটি পূর্বাচল দাশগুপ্তের রচনা-নির্দেশনায় 'সলিউশন'। । এম টি আই-এর বদান্যতায় অপমানিত মাতৃভাষা, তার করুণ এক পরিণতি মেলে 'সলিউশন' নাটকে, যা দর্শকের মনে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে গেল বাংলাদেশ থেকে আসা ছোট্ট দল 'মেঠোপথ থিয়েটার'। রবীন্দ্রনাথের মাধো

বাংলাদেশ মেঠো পথ

কলকাতা শ্রুতিরঙ্গম

সিউড়ি আনন

শিলিগুড়ি দামামা

কোচবিহার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা

চরিত্র নিয়ে লেখা অলোক বসুর 'অতঃপর মাধো' পরিচালনা ও অভিনয়ের মুন্সিয়ানায় উৎকর্ষতার এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয় আমাদের।
শেষ দিন সবাইকে হাসিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটালেন প্রবীণ অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল 'শ্রুতিরঙ্গম' তাঁদের নাটক 'মিথ্যেবাদী' মঞ্চস্থ করে।
কোচবিহার থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল এবার একই সঙ্গে মাথাভাঙ্গা নজরুল সদনেও অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৫-১৬ ডিসেম্বর, আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায়। সেখানে অংশগ্রহণ করেন বালুরঘাট শপথ, বাংলাদেশ মেঠো পথ থিয়েটার ও কলকাতা শ্রুতিরঙ্গম।

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিশু ও কিশোরদের জন্য সাংস্কৃতিক সংস্থা

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রার মত উচ্ছল প্রাচুর্য নিয়ে বৃষ্টিহীন সপ্তাহের তিনদিন, অফুরন্ত প্রাণের উচ্ছাসে ওরা নিজেদের তৈরি করে। নৃত্যের তালে, ভারতনাট্যমের মুদ্রায়, সঙ্গীতের মুর্ছনায়, তবলার লহড়ায়, রং-তুলির ক্যানভাস আর নাট্যের চর্চায় ওরা ব্যস্ত। এদের মূল উদ্দেশ্য শিশু-কিশোরদের সার্বিক বিকাশ। ২০০৮-র ১৫ এপ্রিল কোচবিহার শহরে শিশু-কিশোরদের সংস্কৃতি চর্চার জন্য তৈরি হয় সংগঠন কোচবিহার শিশু কিশোর সংস্থা। এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই তৈরি করা হয় থিয়েটার স্কুল। শুভাশিষ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় একটি নাট্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি হয় ছোটদের থিয়েটার স্কুল। এরপর উদ্যোগ নেওয়া হয় ত্রৈমাসিক মুখপত্র সবুজ মন প্রকাশের। মূলত শিশু-কিশোরদের লেখনিকে পোক্ত করতেই এই উদ্যোগ। প্রতিবছর রবীন্দ্রজয়ন্তী সহ মণীষিদের জন্মদিবস পালন, বিশ্বনাট্য দিবস, বসন্ত উৎসব, সাহিত্য-কলা উৎসব ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এদের নিয়মিত কর্মকাণ্ড।

শিশু কিশোর সংস্থার কাজের ধারা রয়েছে দুই রকম। দীর্ঘমেয়াদী ধারায় রয়েছে সদস্য শিশু-কিশোররা। এরা মূলত স্কুল পড়ুয়া। প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিনে নাট্যের ক্লাস, নৃত্যের শিক্ষা, ছবি আঁকার কারসাজি গ্রহণ করতে হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দির চত্বরেই হয় থিয়েটার স্কুল। এখানে কোচবিহার জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নাট্য ব্যক্তিত্বরা নিয়মিত চর্চা করান শিশু কিশোরদের। অন্যদিকে সাগরিকা গুহ নিয়োগীর তত্বাবধানে ব্রাহ্মমন্দির চত্বর ও শহরের মসজিদ পাড়ায় হয়ে থাকে নাচের তালিম। আবৃত্তি ও ছবি আঁকা সহ এইসব শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে প্রায় ৫০ জন। এছাড়াও আন্তঃবিদ্যালয় কলা উৎসব, বিশেষ নাট্য, নৃত্য, আবৃত্তি, অঙ্কন কর্মশালায় সামিল করান হয়।

ক্ষুদেদের সাথে কখনও সামিল হচ্ছে অভিভাবকরাও, নির্মাণ হচ্ছে নতুন নাটক। সাম্প্রতিক কালে প্রযোজিত এ ধরনের নাটক 'উনোপাড়ার উনোরা যথেষ্ট' প্রভাব ফেলেছে। তৈরি হচ্ছে নতুন নাটক বুড়ো আংলা। তবে জগন্নাথের বাজিমাত, পাগলা গণেশ-এর মত নাটকে অংশ নিয়েছে শুধুমাত্র শিশুরাই। উল্লেখযোগ্য শিশু নাটক লাল কমল, ডাকঘর, বীরপুরুষ, বোকা ভোলার গল্প। সম্প্রতি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একাদশ বর্ষ সাহিত্যকলা উৎসবে কয়েকশ' শিশু-কিশোরের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে উৎসব অঙ্গন। সফল প্রতিযোগীদের অলংকার স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। এ বছর আয়োজিত হয়েছে নাট্যকর্মী সুখজিৎ পাল স্মৃতি আন্তঃবিদ্যালয় অনুনাটক উৎসবের। শিশু-কিশোরদের লেখায় ও আঁকায় সমৃদ্ধ 'সবুজ মন' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ছোটদের এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে ক্ষুদেদের লেখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়। ভবিষৎ প্রজন্মের কবি-সাহিত্যিকদের একটা প্ল্যাটফর্ম এই 'সবুজ মন'। একই সঙ্গে কচিকাচাদের গ্রন্থাগারমুখী করার লক্ষ্যে প্রয়াসী এই সংস্থা। গ্রন্থাগারগুলিতে শিশুদের উপযোগী আকর্ষণীয় বই-পত্র-পত্রিকা রাখা হয় এই আবেদন নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে দরবার করা হয়েছে। শিশু-কিশোরদের বয়ঃসন্ধিজনিত নানা মানসিক সমস্যার সমাধানে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস ও পারস্পরিরক সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিয়মিত কাজ করা হয়।

এখানে এক ঝাঁক শিশু-কিশোর আগামী দিনের উজ্জ্বল সুস্থ সময়ের বাসনায় তৈরি করছে নিজেদের।

পিনাকি মুখার্জি

রাসায়নিক রস

বং কং পরমাণু পালা

গান্ধিজি: কী ব্যাপার বিধান? ঘন ঘন মর্তলোকের কলকাতায় যাচ্ছ দেখছি?

বিধান: কংগ্রেস বুড়োর চিকিৎসা দরকার।

গান্ধিজি: কংগ্রেসের আবার ব্যুরো হলো নাকি? এ সব তো কমিউনিস্টদের হত। ওই পলিটব্যুরো না কী সব!

বিধান: এটা সেই ব্যুরো নয় বাপুজি। বুড়ো। বুড্ঢা। বুড্ঢা হোগা প্রদেশ কংগ্রেস।

রবীন্দ্রনাথ: কালের তুলি সবার মুখেই একদিন জরার আঁচড় এঁকে দেয় বিধান।

বিধান: আপনি বুঝতে পারছেন না গুরুদেব। বঙ্গে পিসিসি-র নেতারা সব বুড়ো হয়ে গেছেন। যে বয়সে বাণপ্রস্থে যাওয়া দরকার সে বয়সে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন।

গান্ধিজি: সে কী! তবে তো হাত কাঁপবে! চরকা ঘোরাবে কী করে?

জহরলাল: কেন? ইন্দু, রাজীব, রাহুল— সবাই তো কম বয়সেই হাল ধরতে শিখেছিল। বঙ্গেও তো কত নবীন এলো। হ্যাঁ রে প্রিয়! তোরা তো নবীন বয়সেই শুরু করেছিলি?

প্রিয়রঞ্জন: নবীন কি ফুরিয়ে গেছে নাকি চাচা? আছে তো।

রবীন্দ্রনাথ: বৃক্ষ থেকে প্রবীণ ফলের দল একে একে না খসে পড়লে কি নবীন ফল পাখির ওষ্ঠে ধরা দেয়?

জ্যোতিবাবু: এটা আসলে চৌতিরিশ বছর আমাদের ফলো করার ফল।

জহরলাল: নবীনরা আছে যখন তাঁদের দায়িত্ব দিলেই হয়।

জ্যোতিবাবু: তবে জোট হবে কী করে? আমাদেরও বুড়ো, ওদেরও বুড়ো। বুড়োয় বুড়োয় মেলে ভালো।

বিবেকানন্দ: দলের নবীনরা বরং কংগ্রেস না করে ফুটবল খেলুক।

রবীন্দ্রনাথ: দলের নবীনরা যেন ভুলে না যায় যে শরতে সবুজ বনানীর উর্দ্ধে যে মেঘ ভাসে তা শুভ্র। সেই শুভ্রতা চুল স্পর্শ করলেই জীবন হয় ধন্য।

জ্যোতিবাবু: বাঃ! এ কথাটা কিন্তু বুর্জোয়া বলে মনে হলো না।

গান্ধিজি: তবে দলের যুব কর্মিদের ভবিষ্যৎ কী? মুভমেন্ট তো তাঁরাই করবে!

বিধান: আচ্ছা! আপনারা কি সবাই মিলে আমার প্র্যাকটিশটা বন্ধ করে দেবেন? আরে! সর্দার প্যাটেল যে! কখন এলেন?

প্যাটেল: বিজেপির হাত থেকে ফাঁক পেয়ে পালিয়ে এলাম। তা কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?

প্রিয়রঞ্জন: বঙ্গে কংগ্রেস বুড়ো গঠিত হয়েছে, তাই নিয়ে।

জ্যোতিবাবু: আমি বলে দিয়েছি বুড়োয় বুড়োয় জোট ভালো হয়। যাদের সঙ্গে চৌতিরিশ বছর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল, তাঁদের ছাড়া চলবে?

প্যাটেল: শুনলাম তোমরা এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারো নি?

জ্যোতিবাবু: সিদ্ধান্ত নিতে আরো কয়েক বছর লাগবে। ততদিন যাতে সবাই সুস্থ থাকে সেটা বিধানবাবু দায়িত্ব।

রবীন্দ্রনাথ: এত বুড়ো কোনোদিনও হব না কো আমি/ হাসি তামাশারে যবে কব ফাজলামি।

গান্ধিজি: কিন্তু এ ভাবে চললে বিজেপি তো আমাকেও নিয়ে নেবে? কিছু একটা করা দরকার। অন্ততঃ জেলায় জেলায় কমবয়সী নতুনদের দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

প্রিয়রঞ্জন: তবেই হয়েছে। পিসিসি কলকাতার বাইরে বেরুবে তাই কখনো হয়? পিসিসি-র কাজই হলো জেলার নেতাদের তলব করা যাতে দৌড়ে দৌড়ে কলকাতায় আসে। নবীনরা এসবে রাজি নাও হতে পারে।

জ্যোতিবাবু: ঠিক। এই কারণে আমরাও বুড়ো ফর্ম্যাটটা বজায় রেখেছি।

রামকৃষ্ণ: হ্যাঁ রে! নরেন নাকি? এলি না গেলি? যত ওল্ড তত গোল্ড!

বিবেকানন্দ: আপনি এসবে আসবেন না প্লিজ!

গান্ধিজি: তাহলে জহর! বঙ্গ কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কী?

জহরলাল: আরো বিশ বছর যাক। দলের তরুণরা বুড়ো হোক। যে বছর পিসিসি-র অধিবেশন আইসিইউ-তে হবে, সে বছর থেকেই ভাবনা শুরু করব।

শিব্রাম: এআইসিসি তবে এআইসিসিইউ গঠন করবে বলছেন? ওকি বিধানবাবু? ছুটছেন যে?

বিধান: পলিটব্যুরো আর কংগ্রেস বুড়ো মিটিঙে বসেছে। মুখ্যমন্ত্রী অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছে। আমার যাওয়া দরকার।

নীরেন্দ্রনাথ: বুড়ো হাতে ভাঙা কাস্তে, বিধান তুমি যাও আস্তে।

(প্রবল সমবেত হাস্য। আলোচনা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল)

অনু ঘটক

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

অভিনব ডুয়ার্সে। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২০০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা
আলিপুরদুয়ার।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার। দ্বিতীয় সংস্করণ
প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা

ক্রাইম থ্রিলার

লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা

ছোটদের বই

সবুজ মনের গল্পগুলি। রীতা রায়। ১২৫ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা
নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে।
২য় খণ্ড ১৫০ টাকা
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা
প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন।
তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা
অরণ্য কথা বলে। শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।
মেইল করুন dooarsbooks@outlook.com **বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।**
ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যাবে (বই না পেলে সরাসরি অর্ডার করুন আমাদের)

শিলিগুড়ি: হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড কাস্টমস বিল্ডিং সংলগ্ন। **ইকনমি বুক স্টল,** কলেজ রোড। **বিশ্বাস বুক এজেন্সি,** হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: আড্ডাঘর,** মার্চেন্ট রোড। **গ্রন্থ ভারতী,** ডিবিসি রোড। **আলিপুরদুয়ার: দীপক কুমার হোড়,** কলেজ হল্ট। **কোচবিহার: এস বি বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স,** রূপনারায়ণ রোড। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** গ্রন্থভারতী। ধানসিঁড়ি। ওয়েস্ট দিনাজপুর বুক সাপ্লাই এজেন্সি। **কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর,** কলেজ স্ট্রিট।

বই আপনার কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে ফোন করুন
উত্তরবঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮, কলকাতায় ০৩৩-৪০৭০ ১৪৪৪

EKHON DUARS, Vol-5, Issue-10 WBBEN/2014/56733, Rs. 20 Only

ডুয়ার্স প্যাকেজ টুর

২ রাত ৩ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা
৩ রাত ৪ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সুনতালেখোলা-জল্পেশ তিনবিঘা-কোচবিহার।
৪ রাত ৫ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা জল্পেশ-তিনবিঘা-কোচবিহার-জলদাপাড়া-বক্সা।
নিউ জলপাইগুড়ি/নিউ মাল থেকে,
ইকনমি/ডিলাক্স প্যাকেজ
যোগাযোগ ৯৮৩০৪১০৮০৮/৯৯৩৮৩২১২৩

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Common Dine-in place for breakfast- lunch-evening snacks-dinner,
Conference Hall;

Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9434442866, 9002772928

মোহিনী
মূর্তির পাড়ে
আয়েশের
সঙ্গে মেশে
রোমাঞ্চ

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.